তৃতীয় অধ্যায়

কমলকুমার মজুমদারের - জীবন ও সাহিত্য (১৯১৪-৭১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রায় সমসাময়িক অন্যতম লেখক হলেন কমলকুমার মজুমদার। তিনি বাংলা সাহিত্যে একক প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দিক্ চিহ্নের মতো আজও দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর অননুকরণীয় গদ্য শৈলীকে নিয়ে। কমলকুমারের জন্ম হয় ১৯১৪ সালের ১৭ই নভেম্বর। তাঁর বাবা প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন কলকাতা পুলিশের অফিসার। তিনি তাঁর বাবা, মা, ঠাকুমা এবং বাবার মামা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর উৎসাহে শৈশবেই নানান শিল্পের সংস্পর্শে আসেন। তিনি বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন চরিত্রের নির্ভীকতা, অনমনীয়তা এবং দৃঢ়তা। অন্যদিকে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী, রুচির সূক্ষ্মতা পেয়েছিলেন মা'র সাহচর্যে। মা রেণুকাময়ী কিশোর বয়সে কমলকুমার ও তার ভাই যিনি পরবর্তীকালের বিখ্যাত শিল্পী - সেই নীরদকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।[১] কমলকুমার এবং ভাই নীরদ চব্বিশ পরগনার বিষ্টুপুর 'শিক্ষাসংঘ' বিদ্যালয়ে একই - শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুধীর চট্টোপাধ্যায় পুকুর পাড়ে মাছ ধরতে ধরতে বিশ্বের সেরা ছোট গল্প শোনাতেন। এর কয়েক বছর পর এই স্কুল ছেড়ে কলকাতার ক্যাথিড্রাল মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু প্রায়ই বাবার লেখা নকল করে ছুটি নেওয়া ধরা পড়লে এই স্কুল ছাড়েন এবং ভবানীপুরের সংস্কৃত টোলে ভর্তি হন। এখানে তাঁরা মাথা ন্যাড়া করে টিকি রেখে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করতেন। এই সময় থেকেই ঠাকুমার প্রভাবে ভগবৎ সাধনার দিকে ঝোঁকেন। বাড়ির পরিবেশেই শৈশব কালে কমলকুমার অনেক জ্ঞানীগুনীর সংস্পর্শে আসেন। একটি রচনায় তিনি লিখেছেন 'ছেলেবেলাতে আমাদের ব্লকম্যান স্ট্রীটের বাড়িতে আমরা নিরুপমা দেবী, সরলাদেবী, শরৎবাবু বহু গণ্যমান্যকে আসিতে দেখিয়াছি ...।' এই সময় থেকেই কমলকুমার সাহিত্যপাঠ, সেতার বাজান এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা শুরু করেন। তাঁর আঁকা শিক্ষা এ সময় থেকেই শুরু হয়।

'উষ্ণীষ' নামে যে পত্রিকা ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত হতো(১৯৩৭) তার সম্পাদক ছিলেন কমলকুমার। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কমলকুমার 'লালজুতো' গল্প ও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং মুঙ্গের ভূমিকম্প বিষয়ে একটি রচনা লেখেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় কনুদেব ছদ্মনামে লেখেন একটি কবিতা ও 'মধু' গল্প, তৃতীয় এবং শেষ সংখ্যায় লেখেন 'প্রিন্সেস' গল্প। কমলকুমার যখন জাহাজের আমদানি রপ্তানি, মাছের ভেড়ি, ডিডিটি প্রভৃতির ব্যবসা শুরু করেন, সে সময় প্রচুর অর্থাগম হয় এবং তিনি অত্যন্ত বিলাসী হয়ে ওঠেন। বাজারের মূল্যবান ও সেরা প্রসাধনী, পোশাক ছাড়া তিনি ব্যবহার করতেন না। পোশাকে কেতা দুরস্ত কমলকুমারকে দেখে মার্সেল স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন মহম্মদ জিন্নার পর এত ওয়েল ড্রেসড্ ভারতীয় নাকি আর দ্বিতীয়টি দেখেননি।'[২] সাঁওতাল পরগণার রিখিয়ায় কমলকুমারের বাবা একটি বাড়ি তৈরি করেন। ১৯৪১ সালে জাপানী বোমার আতঙ্কে রিখিয়ায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। রিখিয়া সম্পর্কে কমলকুমারের যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটা রাধাপ্রসাদ গুপ্তের একটি বিবরণ থেকে কিছুটা জানা যায়। তিনি বলেছেন, 'কমলবাবু জাঁ রেনোয়াকে রিখিয়া যাওয়ার কথা বলেছিলেন। ফরাসিতে রিখিয়ার যে বর্ণনা তাঁকে দিয়েছিলেন তার ইংরাজি করলে দাঁড়ায় 'Plenty of Sun, plenty of rain and innumarable silence' এই রিখিয়াতেই কমলকুমার প্রকৃতি আর মাটির মানুষদের, তাদের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, 'অগনিত ছোটলোকের ঘর্মাক্ত কলেবর, কুলি-কামারির শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন, জেনেছেন, এখানের মানুষ তাকেই সুখী বলে জানে যে বর্তনে খায়, বালিশে ঘুমায়, দেখেছেন সৌন্দর্যের কুৎসিত প্যারডি আর গেরি-হরিৎ-কমলার চলমান রং প্রকৃতিকে বিসর্জনকারী চেষ্টার।'[৩] কমলকুমার প্রকৃতিকে এখানে যেভাবে দেখেছেন তার সঙ্গে তার পূর্ববর্তী লেখক বিভূতিভূষণের প্রকৃতিকে দেখার মধ্যে অনেকটাই তফাৎ রয়েছে। কমলকুমার একজন চিত্র শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃতিকে দেখেছেন, বিভূতিভূষণ সেখানে যেন অনেকটাই কবি হয়ে উঠেছেন। কমলকুমার রিখিয়ার আকাশে অনুভব করেছেন

'চিরব্রাহ্মণ্য, মৃত্তিকা বিস্তার হয় উৎসবময়ী ফোয়ারা'।[৪] রিখিয়াতে এই সময় অনেক গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। কবি বিষ্ণু দে রিখিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে একটি বাড়ি কিনেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত কমলকুমার দে'র বাড়িতেই উঠতেন। কোলাহল কুৎসিত নগরের ভিড়ে ক্লান্ত হয়ে তিনি সাঁওতাল পরগণার নির্জন প্রকৃতির কোলে পালিয়ে এসেছেন। অলোক রঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন -

> সেই পল্লীতে শরনার্থী মানুষের একটি শিল্প সংসার
> সেদিন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। নাচ, গান জলসা।[৫]

কমলকুমারের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল 'কাফে দ্য রোকিও নামে একটি রেস্তোরা।' রিখিয়াতে দেওয়াল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যচর্চা গড়ে উঠেছিল যার সম্পাদক ছিলেন কমলকুমারের বোন গীতা এবং সহ-সম্পাদক প্রতিবেশিনী দয়াময়ী। দয়াময়ীর সঙ্গে কমলকুমারের এখানেই প্রথম পরিচয় এবং প্রেম হয় যা পরিণয়ে পরিণত হয় ১৯৪৭ সালে। এ বছরেই তিনি এফ-এ পাশ করেন। যদিও তিনি মনে করতেন যে একজন মানুষকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হয়।

কমলকুমার কর্মানুসন্ধানে কলকাতায় এসে আসেন ১৯৪২-এর দিকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সমগ্র বিশ্বকেই বিধ্বস্ত করে তুলেছে। কলকাতাবাসীরাও কলকাতা ত্যাগ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রান হারিয়েছে গ্রামে শহরে। সেই সঙ্গে শুরু হল দাঙ্গা। কমলকুমার ১৯৪২ সালের দাঙ্গা, আন্দোলন, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর সারা জীবনে ভুলতে পারেননি। তাঁর গল্প উপন্যাসগুলিতেও বারে বারেই এই সময়ের তিক্ত অভিজ্ঞতার চিত্র দেখতে পাই। 'নিমঅন্নপূর্ণা' তার এই সময়ে অভিজ্ঞতারই ফল। আবার একেবারে শেষের দিকের উপন্যাস 'খেলার প্রতিভা'তেও রয়েছে 'ফ্যান দাও'-এর করুণ আর্তনাদ। অনেক চিঠি পত্রেও কমলকুমার এই সময়কার (১৯৪২) প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন -

আমি ৪২ দেখিয়াছি যেদিন আমার পরনের মানে গলার টাই
খুলিয়া পোড়াইয়া দিল, পথে সেদিন যেসিন গানিং হইল।
গুলি অনবরত চলিতে থাকে, তাহা ব্যতীত রায়েট যে কি অর্থাৎ
কি হিন্দু কি মোছরমান শালারা যে কি দুশ্চরিত্র হইতে পারে
আর ইংরাজ বাস্কতরা যে কি শয়তান, কত বড় হারামী।
অনেকেই বাড়িতে মানে দরজায় কুশ আঁকিতে (এন্টালীতে) কেহ
ইউপিয়ন হ্যাক তুলিতে বাধ্য হইয়াছিল।[৬]

যুদ্ধের কলকাতা, মন্বন্তর, মুদ্রাস্ফীতি, ইংরেজ সৈনিকদের দাপট, ব্ল্যাক আউট জর্জরিত ভারতবর্ষের বাস্তব চিত্র রূপায়নে শিল্প কলার ভূমিকা কী হবে, সমস্যা জর্জরিত সমাজচিত্র রূপায়নে আধুনিক শিল্প কলার ভূমিকা কী হবে - এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তখনকার সব শিল্পীকেই। ১৯৪৬-৪৭-এর অন্যতম কবি ছিলেন জীবনানন্দ। যুদ্ধ মন্বন্তরের ধ্বস্ত সময়ের চিহ্ন জীবনানন্দের কবিতায় এসেছে, যেমন নিরীহ, ক্লান্ত ভিক্ষান্নেষীদের গান। ১৩৫০ পৌষ 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তিমির হননের গান' বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। 'কার্তিকের ভোর ১৩৫০' কবিতায় দেখা যায় এই ছবি -

তেরোশ পঞ্চাশ সালে কার্তিকের ভোর, সূর্যালোকিত সব স্থান
যদিওলঈলর খানা
যদিও শ্মশান
তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে
সূর্যালোকিত হয়ে গেছে।

অথবা 'এই সবদিনরাত্রি' কবিতায় রয়েছে -

এ-রকম ভাবে চলে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিক চিহ্নহীন,
কেবল পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর -
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তবে
অনেক বেডের প্রয়োজন,
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে,
বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চিরকুট' কাব্য গ্রন্থে পাওয়া যায় সেই দুর্দিনের চিহ্ন-মেশা কবিতা - 'পথের দু-ধারে বাসা বেঁধেছে কঙ্কাল, গ্রাস করে খাঁ খাঁ - শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে ভগ্নদূত শাঁখা।' - স্বাভাবিক ভাবেই কমলকুমারের মধ্যে শিল্প সম্পর্কে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে।

যদিও সারাজীবন চিত্রকলার চর্চা করলেও চিত্রকর কখনো হতে চাননি বা কথা সাহিত্যিকও হতে চান নি। কিন্তু নতুন পথের সন্ধান করতে সচেষ্ট ছিলেন সর্বদাই। এই নতুনের সন্ধানেই তিনি গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসে বাংলা গদ্যকে নতুন পর্যায়ে দাঁড় করালেন। রচনা করলেন 'জল', 'তেইশ', 'মল্লিকাবাহার' যা তার রচিত প্রথমের 'লালজুতো', 'মধু' 'প্রিন্সেস' গল্পগুলির সঙ্গে বিষয়ে এবং রচনারীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যা আলোরণ সৃষ্টি করেছে।

কমলকুমারের সঙ্গে দয়াময়ীর বিয়ে হয় ১৯৪৭-এ ৮ই মার্চ। দক্ষিণ কলকাতার কোন একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই বিয়ে হয়, এবং বিয়ের কিছুদিন পর তারা যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যান। দয়াময়ীকে বিয়ে করার বিষয়ে কমলকুমারের মনেও শেষে দ্বিধা দেখা গিয়েছিল। এই সময়ের ডাইরিতে কমলকুমার লিখেছেন -

> যত দিন যাচ্ছে ততই কেমন ঠেকছে। ভগবান। সে সব দিনের মধ্যে আলো বাতাস ছিল, মিথ্যে ছিল না। আজ মনে হয় ও যেন কোথায় একটু স্বার্থপর। ... আগে ভাবতাম ওর বুদ্ধি আছে কিংবা অহংকার এখন দেখি তা নয় - ওর আছে অজ্ঞতা। তার - দুর্বল শরীর। তাছাড়া মেয়েরা একটু গাধা গোছেরই হয়। ... আমি আর ভগবানের কাছে কিছুই চাইছি না, আমি কিছুই চাই না, শুধু সাহস ... ভয় নেই ভয় নেই।[৬]

বিয়ের পর প্রথম সংসার শুরু করেন আনন্দ পালিত লেনে। কিন্তু সেখানে স্থায়ী বাস হয় নি। ক্রমাগত বাড়ি বদল করা কমলকুমারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। বিয়ের পর থেকেই তাদের জীবন যে বন্ধুর-পথে চলতে শুরু করে তা দয়াময়ী মজুমদারের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় -

> সেই থেকেই আরম্ভ হল ভয়ানক এক সংগ্রামের জীবন, স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় বহু ব্যতিক্রমই ছিল যেন মনে হয়। ... জীবন আর পরিবেশে ভয়ঙ্কর একটা গরমিল ঠেকত।[৮]

এভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বাসা বদল করে কাটে, কখন হোটেলেও কাটিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত স্থায়ী বাসা বাঁধেন পাতি পুকুরে, যদিও অভাব ছিল সেখানে নিত্যসঙ্গী।

১৯৪৭ সালে দেশ জুড়ে যে দাঙ্গা হয় তাতে কমলকুমার রিলিফের কাজে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন কিনা তা জানা যায় না। দাঙ্গায় হিন্দু মুসলমান উভয়শ্রেণীর মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন -

আমি রায়টে (Riot) ১৭ আগষ্ট হইতে বহু যারাত্মক ব্যাপার দেখি ১৮ই হইতে বহু রিলিফ করি। কত যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগের মধ্যে সেদিন হইতে ঐ ২০ তারিখের মধ্যে গিয়াছি তাহা ঠাকুর জানেন। যতদূর মনে পড়ে ২১ তারিখ হইতে প্রবল বারিপাতে ঠান্ডা হয় - সারাদিন পথে পথে আলো নিভানো হয় নাই কুকুরেরা যে কোথায় কেহ জানে না সে এক বীভৎস ব্যাপার।[৯]

তার লেখা আরো বিবরণ জানা যায় -

সেই দিন কার রায়েট এই গঙ্গা দিয়া অসংখ্য কুপাইয়া কাটা খাবলান দেহ যাহার উপরে বসিয়া কাক ঠোকরাইতে আছে, ভাটার টানে চলিয়াছে - এতই বীভৎস দৃশ্য ইহা যে এই সুউচ্চ ব্রীজে দাড়াইয়া থুথু ফেলিয়াছি, যখন পুলের নীচে প্রায়, আমি পা সরাইয়া লইয়াছি।[১০]

ফরাসী চিত্র পরিচালনা জ্যঁ রেনোয়া ১৯৪৮-এ কলকাতায় আসেন 'দ্য রিভার' ছবির শ্যুটিং করতে। কমলকুমার সত্যজিৎ - এই ছবির থেকে চলচ্চিত্র নির্মানের অভিজ্ঞতা হাতে কলমে অর্জন করেন। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত কমলকুমারের সঙ্গে রেনোয়ার সাক্ষাৎকারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে কমলকুমার তাঁকে (রেনোয়া) বলেছিলেন -

বাংলা দেশের ওপর ছবি করতে গেলে হোটেলে থাকলে চলবে না, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, রাস্তা-ঘাটে ঘুরতে হবে রোদে পুড়তে হবে, একপেট খেয়ে গরমকালে বটগাছের ছায়ায় ঘুমতে হবে, জলে ভিজতে হবে, গঙ্গার রূপ দুচোখ ভরে দেখতে হবে।[১১]

কমলকুমার জীবনের একটা সময়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সালে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়, এর কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমলকুমার। এই ফিল্ম সোসাইটি থেকে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চলচ্চিত্র রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিচালক ছিলেন সদ্য হলিউড ফেরত হরিসাধন দাশগুপ্ত। চিত্রনাট্য করবেন সত্যজিৎ রায়, কমলকুমার ডিটেল এবং শিল্প নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন। কমলকুমারের মতে - সন্দীপের কিশোর চেলা অমূল্য পুলিশের গুলি খেয়ে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, পুকুরের জলে তার মাথা, দেহ সিঁড়ির ধাপে, অকস্মাৎ শান্তিভঙ্গের ফলে অমূল্যের মাথায় ভাসমান চুনের পাশে গেড়ি গুগলি ভেসে উঠল। [১২] তবে কমলকুমার 'ঘরে বাইরে'র জন্য যে স্কেচ করেছিলেন তার একটাও অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায় দেখতে পাননি।

কমলকুমার একেবারে মাটির মানুষের খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন ভারত সরকারের ১৫০ টাকা বেতনের জনগননা বিভাগে চাকরী সূত্রে ১৯৫১ সাল নাগাদ, এ সময় জনগণনা বিভাগে সেন্‌শাস্‌ কমিশনার ছিলেন অশোক মিত্র। এই সময় 'মল্লিকা বাহার' গল্পটি প্রকাশ হয়। কমলকুমার 'হরবোলা' নাট্যদলের (১৯৫২) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিছুদিন, যার সঙ্গে সুনীল গাঙ্গুলি কৈশোরে যুক্ত ছিলেন। কমলকুমার এই সময় ওয়েস্টবেঙ্গল রুরাল আর্টস এ্যান্ড ক্রাফট্‌স-এ কিছুদিন যুক্ত থেকে ললিতকলা আকাদেমি কলকাতা শাখায় কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি মাঝে মাঝেই অজ্ঞাতবাস করতেন এবং কাউকে বাড়ির ঠিকানা দিতেন না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন -

> কমলদা শ্যামবাজার পর্যন্ত এসে তারপর হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যান।

অনেকের মতে তিনি মনমতন মার্জিত, উপদ্রবহীন অথচ কম ভাড়ার বাড়ির জন্য অস্থির হয়ে উঠতেন, অথবা চরম দারিদ্রের জন্য পাওনাদারদের কাছ থেকে হয়তো পালিয়ে

বেড়াতেন। তবে ১৯৭০ থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত হাজরা রোডের বাড়িতেই কাটিয়েছেন।

১৯৫৫ সালে তিনি সাউথ পয়েন্ট স্কুলে আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৯-এর মধ্যে 'মতিলাল পাদরী' ও 'তাহাদের কথা' এই দুটি গল্প এবং নবযুগ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি নিয়ে পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই উপন্যাস সম্পর্কে রাধাপ্রসাদ গুপ্তের অভিজ্ঞতা হল -

> দেখি হাতে একটা সদ্য ছাপ প্রুফের পাকানো বান্ডিল। পরে দেখলাম সেটা 'অন্তর্জলী যাত্রা'র বাঁধাবার আগের একটা কপি। তখনও যেন একটু ভিজে ভিজে। কমলবাবু আমায় বললেন - 'পড়ে বোলো কেমন লাগলো। আমি রাত দুপুর অব্দি এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম। সে এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা।[১৩]

এই উপন্যাসটি বাংলা ভাষা এবং উপন্যাসের জগতে এক আশ্চর্য সংযোজন। এই উপন্যাস নিয়ে একদল পাঠকের যেমন মুগ্ধতা, আবার অন্য আর এক দলের ছিল সংশয় অবজ্ঞা। যা লেখক কমলকুমার সম্পর্কে বর্তমানেও রয়েছে। একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধে কমলকুমার সমসাময়িক অন্যান্য রচনার সঙ্গে নিজের সাহিত্য ভাবনা, রীতি, ভাষা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এবং তার নিজের অবস্থান-ই বা কোথায় সে সম্পর্কেও মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন।

কমলকুমার হাঁপানী রোগে এক সময় ভীষণভাবে আক্রান্ত হন, এই রোগে মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল। তিনি কোন দিনই এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পক্ষপাতি ছিলেন না, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তিরিশ চল্লিশ দশকের লেখকদের সম্পর্কে কমলকুমারের খুব একটা উচ্চ ধারনা ছিলনা, ঐ উক্ত নবতম গোষ্ঠী এমনকী বাংলা

সাহিত্যের কিছুই জানে না, যে এবং চারুবাবুর কাছে শুনিয়াছি পাশ্চাত্য সাহিত্যে সংস্কৃতি বিষয়েতে উহারা নিতান্ত কাঁচা।[১৪] আবার চল্লিশের দশকের বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যকীর্তির গুণগান করেছেন কখনো বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার চরণাংশ নিজের গল্পের শিরোনাম করেছেন (অনিত্যের দায় ভাগ)।

১৯৭০-৭১-এর দিকে তিনি সি·আই·টি রোডের বাড়ি ছেড়ে হাজরারোডের বাড়িতে চলে আসেন। কমলকুমার এই সময় প্রচন্ড অর্থ কষ্টে ছিলেন। সুব্রত চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে জানান 'আমার মত মার্বেল জীবন কেহই অতিবাহিত ও নির্বিঘ্নে অর্থাভাব কেহই ভোগ করিবেনা।' কমলকুমার বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনে বাড়তি পয়সা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, প্রয়োজনের তুলনায় অর্থবান হওয়া গ্লানি কর। এই সময় তার নিজের প্রতিও হতাশা এসেছিল। কমলকুমার বেঁচে থাকাকালীন সময়েই নক্শাল আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪২-৪৭ সালের দাঙ্গাতে মানুষের অসহায় অবস্থা আর ৭১-এর নক্শাল আন্দোলনে তরুণদের আত্মাহুতিকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এই ভাবে - "8th

> খুব ভোরে গুলি আর বোমার আওয়াজে উঠিলাম, সতুর নীচে গেলাম ... অবিনাশ ব্যানার্জী লেনের আর সি·আই·টি রোডের মুখে অন্তত কুড়িটা রিভলভার ছুটিতেছে কারণ কেহই তাক্-টাকের ধার ধারে না, অনেকটা Defensive measure যেন machine gun ফলে যাহাকে বলে static লড়াই তাহারা বোমা ছুঁড়িতেছে, তুমি লক্ষ্য করিয়া থাকিবে শতকরা ৮০ ভাগ এ হেন বিদ্রোহে ১২।১৪ বছরের ছোড়ারা বেশী ফলে এমত রিভলভারের গুলিতে কেহ বলে চারটে কেহ বলে ২টি (মানে সরকারী খবর) পড়িল, তাহারা অল্প বয়সী। নিষ্কণ্টক হইল। আমাদের অঞ্চলে শুনি সি·পি·এম নাই। গত ১১ বা ১২ অক্টোবর সমূলে উপড়ান হইয়াছে। সেদিনের ছোঁড়াদের হাতে ছোরা বগলে ট্রান-জিস্টার, কাহারও মুখে গামছা বাঁধা হা হা করিয়া ছুটিয়াছে

> বোমা হাতে দারুন খেলা। ... কিন্তু যে শালারা আজ ভোটে দাঁড়াইবে। সমাজতত্ত্ববিদেরা অনেক উত্তর তৈরী করিবে বেকার, এবং নানা ব্যাপার।[১৫]

নকশাল আন্দোলন তাঁর মনে বেশ রেখাপাত করেছিল যার ফলে তিনি এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন যেমন 'খেলার অপসরা' কিন্তু এ গল্পটির পান্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, প্রকাশিতও হয়নি কোথাও। এছাড়া 'কালই আততায়ী' গল্পটি কৃত্তিবাস অক্টোবর ১৯৮০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং 'যামলার শুনানী' নামে আর একটি অসম্পূর্ণ গল্পের পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে।[১৬]

৭০-এর দশকে বাংলাদেশের যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই যোদ্ধাদের জন্য তাঁর শ্রদ্ধা ছিল - যা তিনি 'পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে' একটি নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন। ১৯৭১ সালে কমলকুমারের মা রেণুকাময়ীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুতে তিনি খুব-ই ভেঙ্গে পড়েছিলেন, একটি চিঠিতে তিনি এই মৃত্যু সম্পর্কে লেখেন -

> মা'র মৃত্যু আমাকে বাক্যহীন করিয়াছে, বাবার মৃত্যু আমাকে খুবই কষ্ট দিয়াছিল, আমার বাবা অতীব স্নেহপ্রবণ Loving ছিলেন কিন্তু তবু মা ছিলেন, এখন তিনি নাই।[১৭]

বস্তির ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নাচ, গান, ছবি আঁকা, নাটক, লেখাপড়া শেখানোর একটি স্কুল খোলেন কমলকুমার, যদিও স্কুলটি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কমলকুমারের মধ্যে বৈচিত্র্যের সমাহার দেখতে পাই, বিচিত্র বিষয়েও তার অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি কখনো ফৈয়াজ খাঁর গান, কখনো গ্রাম্য শিল্পীদের ডোকরার কাজ কখনো মার্সেল প্রুস্তের রচনা, কখনো দুবরাজ পুরের ডাকাতদের চরিত্র কখনো রাম-প্রসাদী গানের ভাষা ব্যবহার, কখনো উইলিয়াম ব্লেকের কাব্য কখনো সোনাগাছির গনিকাদের মধ্যে প্রচলিত ছড়া আবার কখনো যামিনী রায়ের ছবির বিষয়ে আলোচনা করতেন। এছাড়াও 'আইকম বাইকম', 'ছড়া সংগ্রহ', 'অঙ্কভাবনা' সংকলন ও

সম্পাদনা করেছেন। এক সময় তিনি নাট্য পরিচালনায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, প্রযোজনার ক্ষেত্রে অনেক নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। কখনো বা কাঠ খোদাই-এর কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আবার জলরঙের বহু স্কেচও করেছেন একসময়। আর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যখন দু-একটি উপন্যাস, ছোটগল্প লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তখনই আবার পাঠকদের থেকে যেন কিছুটা স্বেচ্ছায়া নিজেকে সরিয়ে নিলেন। সুনীল গাঙ্গুলী বলেছেন -

> তার মুখের ভাষা অতি জীবন্ত, অর্থাৎ যাকে বলে কাঁচা বাংলা।
> অথচ তিনিই যখন নিজের লিখিত রচনা কয়েক পাতা শোনাতেন,
> সে ভাষার অর্থ উদ্ধার করতে মাথা ঘুরে যেত।[১৮]

কমলকুমার সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো তার সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা তাঁর সম্পর্কে বেশ উদাসীন ছিল।

১৯৭১ সালে ১-ই ফেব্রুয়ারি ৬৪ বৎসর বয়সে কমলকুমার হাজরা-রোডের বাড়িতে নিঃসন্তান অবস্থায় কার্ডিয়াক আক্রমনে হঠাৎ মারা যান। মৃত্যুর তিন-দিন পূর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিখেছেন সুব্রত রুদ্র। 'শেষ তিন দিন' নামে 'কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি' সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত। এই একই দিনে মারা যান বনফুল। কমলকুমারের মৃত্যুর পর অনেক সমালোচক তার রচনা সম্পর্কে বিবিধ মন্তব্য করেছেন। কমলকুমারের মৃত্যু সংবাদ ১০ই ফেব্রুয়ারিতে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। সন্তোষকুমার ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকায় 'যৌথ যাওয়া' শিরোনামে লেখেন -

> তার সবটা নেব না কিছু কিছু নেব। বাংলা গদ্যের আর
> একটা দিক খুলে যাবে। তার ব্যবহৃত শব্দনিচয়। প্রয়োগে

> প্রয়োগে তারা জীবন্ময় হয়ে উঠবে। কমলকুমারের কৃতিত্ব দেখা যাবে নানা শব্দ সমবায়ের অভূতপূর্ব ব্যবহারে। সেখানে তিনি মৃত্যুর মুখে থুৎকার ছিটিয়ে সঞ্জীবিত থাকবেন। ... যতদিন বাংলা গদ্য আছে এবং তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা ততদিন কমলকুমারের মৃত্যু নেই।[১৯]

স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় লেখা হয় -

> Majumdar has earned a permanent place in Bengali literature, but his contribution to theatre may be more exciting.[20]

যুগান্তর পত্রিকায় অমরেন্দ্র চক্রবর্তী লেখেন -

> খাঁটি বাঙালিয়ানা বলতে সত্যিই যা বোঝায় কমলকুমারের সাহিত্যে তা ভীষণভাবে জড়ানো। প্রাচীন ঘাটের শ্যাওলার মতন। পোড়ো মন্দিরের চটা ওঠা কাজের মতন।[২১]

খুব বিশেষ ভাবে আলোচিত না হলেও, এরকম কিছু মন্তব্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার জীবিত কালের মতোই মৃত্যুর পরেও পাঠক এবং বিদগ্ধ-মণ্ডলীর একটা বৃহৎ অংশ তাঁর সম্পর্কে নির্বাক। তবে সময়ে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমলকুমার সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে, কারণ নবীন পাঠকেরা হয়তো অনুধাবন করছে যে কমলকুমার বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছেন।

কমলকুমারের ছোটগল্প

কমলকুমার ব্যক্তিজীবনে যেমন ছিলেন একজন সাহিত্যিক অন্যদিকে ছিলেন চিত্রকর। কাজেই তার সাহিত্যেও সক্রিয় ছিল তাঁর চিত্রকলা। পিকাসো বলেছেন - "I do not search, I find" - কমলকুমারও চিত্রকে দেখতে পান অত্যন্ত অনায়াস ও সাবলীলভাবে এবং এই চিত্রময়তাতেই তার গল্পের গল্পত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। কমলকুমার যে সময় যুবক,

সে সময়টিতে চারিদিকে যুদ্ধ দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষ এই নিয়েই মানুষের প্রতিনিয়ত পথ চলা। তার সাহিত্য, বিশেষ করে বেশ কিছু ছোট গল্পে এই সময়, সমাজ তার মানুষদের নিয়ে উঠে এসেছে। কমলকুমারের গল্পগুলিকে রচনার ভঙ্গীতে দু-ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম দিকের গল্পে দেখতে পাই সেখানে গল্পেরসই প্রধান হয়ে উঠেছে ('জল' থেকে 'সুহাসিনী পয়েটম' ১৯৪৮-১৯৬৫)। আর অন্য একটি পর্যায়ে ('রুক্মিনীকুমার' ১৯৬৮ থেকে শেষ পর্যন্ত) দেখতে পাই গল্পে গল্পরস অপেক্ষা ভাষার বিচিত্র প্রয়োগ কৌশল, পরীক্ষা নিরীক্ষা-ই প্রধান হয়ে উঠেছে এবং এই পর্যায়েই তার ভাষা ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছে।

কমলকুমারের প্রথম প্রকাশিত গল্প হলো 'লালজুতো' ১৩৪৪ সালে উষ্ণীষ পত্রিকায় ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটি মধুর কিশোর প্রেমের গল্প হলেও গতানুগতিক প্রেমের গল্পের মতো নয়, এটি ভিন্ন প্রকৃতির,এ গল্পে দেখা যায় একটি কিশোর বাজারে নিজের জুতো কিনতে গিয়ে দুটো ছোট ছোট লালজুতো কিনে নিয়ে আসে এবং কিশোরী গৌরীর কোলে তুলে দিয়ে তার মধ্যে মাতৃত্ব দেখতে চায়, এবং নিজেও সে পিতৃত্ব অনুভব করে। মানুষের বিভিন্ন বয়সে বা বয়ঃসন্ধিক্ষনে যে বিচিত্র মানসিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে লেখক এ গল্পে এনেছেন। কিন্তু কমলকুমারের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় এ গল্পের দ্বারা দিক্ নির্দেশ করে না। এই একই সময়ে আরো দুটি গল্প প্রকাশিত হয় 'উষ্ণিষ' পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'প্রিনসেস' এবং পৌষ সংখ্যায় 'মধু'। দুটি গল্পের প্রথমটির মধ্যে রয়েছে সর্বহারাদের প্রতিনিধি কমিউনিষ্ট এক যুবক যে সমাজের অবকাশজীবী শ্রেণীর প্রতিনিধি রাজকুমারী লছমীর মধ্যে সর্বহারাদের জন্য মমতা জাগাতে চেষ্টা করে। আর অন্য গল্পটিতে রয়েছে এক মধুয়ালীর কেবলমাত্র সৌন্দর্যের রোমান্টিক আর্কষনে আকৃষ্ট হয়েছে। এই গল্পগুলি যখন কমলকুমার রচনা করেন তখন তার বয়স মাত্র তেইশ বছর। রচনার ক্ষেত্রে তখনও তিনি নিজস্বতা গড়ে তুলতে পারেননি।

কমলকুমারের শিল্প সৃষ্টির প্রকৃত স্ফুরন ঘটে ১৯৫৫ সালে 'জল' গল্পটির মাধ্যমে। এই গল্পটি এক পথিকৃৎ লেখককে চিনিয়ে দেয়। বন্যাপীড়িত মানুষদের নিয়েই গল্পটি রচিত হয়েছে - কিন্তু 'বন্যা'র বিষয় নিয়ে অন্যান্য লেখকদের থেকে এ রচনা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। প্রথম দিকের গল্পগুলি লেখার পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে (প্রায় ১১ বছর) তিনি এই গল্প রচনা করেন। ইতিমধ্যে তার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে দেশজোড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম, অভাব, খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় উন্মাদকারী দলের সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। জীবনে পথ চলতে বিচিত্র জীবিকাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়ে ব্যবধান তার পরবর্তী গল্পগুলির পরিবেশকে ও সম্পূর্ণরূপে ভিন্নমাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। 'জল'(১৩৫৫) গল্পে দেখা যায় - বন্যাপীড়িত দু-জন মানুষ নন্দ আর ফজল এরা দুর্বল এবং ধর্মভীরু মানুষ। এরা অসহায় অবস্থাতেই উপায়ন্ত না দেখে ডাকাতি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরা দুজনেই একই ছদ্ম নাম গ্রহণ করে - 'কানাই' এই কানাই যেন এক তৃতীয় ব্যক্তি, সব দোষ কানাই-এর। "পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভালো লোক, ... - কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন। ... সে হয় কানাই, সে না হয় ফজল, তার নাম কানাই তবু ফজল খতমত খেয়ে গিয়েছিল ঠিকই।" এরা দুজন যাকে লুণ্ঠন করল সে ধনী নয়, পথচারী তাদের মতোই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কেবল তারা লুঠ করতে সমর্থ হয়েছে। এই বন্যাপীড়িত মানুষদের অসহায়তার প্রতি আমাদের এক ধরনের সহানুভূতি রয়ে যায়। এ গল্প থেকেই কমলকুমারের বাংলা গদ্য অন্য চালে চলতে শুরু করে। দারিদ্র ক্লিষ্ট এই মানুষদের দারিদ্রের পেছনে যে আল্লা বা ভগবান নয় মানুষেরই কারসাজি সেটা তারা বুঝতে পারে না। তাদের কাছে বাবুরা 'তারা লোক ভাল'। বাবুরা যে মাছটা খায় না সেটা তারা দান করে - এই দান নিয়েই ফজলরা তুষ্ট, বাবুদের ভালত্বের গুনগান করে তারা। বাবুদের এই দান, ভালত্ব

মহতের প্রকৃত চেহারা যে কী, সেটা বুঝতে পেরেছিল 'তেইশ'(১৩৫৫) গল্পের এক প্রান্তিক চাষী - আলম।

কমলকুমার যে সময় গল্প রচনা শুরু করেন তখন মহাযুদ্ধ। দেশজুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম দুর্ভিক্ষ, তেভাগা আন্দোলন - জীবনের নানা স্তরে একটা অস্থিরতা। এ সময় দেখা যায় ধনী হয়েছে মধ্যবিত্ত কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক হয়েছে প্রান্তিক চাষী আর প্রান্তিক চাষীরা হয়েছে ভূমিহীন। আর অন্যদিকে রয়েছে সমাজে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনী শ্রেণী। 'তেইশ' গল্পে আলমের ভূমিহীন হবার পেছনে তার ভাগ্য নয় একমাত্র বাবুই দায়ী এই বাস্তবতাবোধটুকু আলমের রয়েছে আর সে কারণেই সে 'খেপে ওঠা'র চেষ্টা করে। কিন্তু তার মতো ভূমিহীন চাষীরা তার সঙ্গে একত্রিত হয়ে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত হয় না। তারা ভাবে একজোট হলেও সর্বনাশ হবে। আলম তার সমগোত্রীয়দের একত্রিত করতে বলে – 'বন্ধু আমরা খেপে উঠতে চাই, অন্য গতিক নাই, খেপে আমাদের উঠতেই হবেক, বিহিত একটা করব - মরণ তুমিও লাগো, কাঙাল দুকী আর আমরা থাকব না ক্ষেপে উঠব।'[২২] কিন্তু সংগ্রামের সঙ্গী সে পায় না, আলমের প্রতিবাদী মন ভেঙে পড়ে সে আত্মহত্যা নয়, আত্মক্ষয়কেই বেছে নেয় এবং নিজে অন্ধ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে তথাকথিত ধর্ম পিপাসু বাবুদের ধর্মাচরণের সুযোগ করে দেয়।

কমলকুমারের প্রথমদিকের গল্পের মধ্যে বিষয়বৈচিত্র্যে যে গল্প সবচেয়ে চমকপ্রদ তা হল 'মল্লিকা বাহার'(১৩৫৮)। 'এরকম বিষয় বস্তু নিয়ে গল্প লেখার কথা বাংলায় আগে কেউ চিন্তাও করেন নি।'[২৩] গল্পের ভাষার ক্ষেত্রেও বেশ নতুনত্ব চোখে পড়ে বাংলা বিশুদ্ধ বর্ণনারীতি এতে নেই, এর বাক্য গঠনও ভিন্ন জাতের। "এখনও মল্লিকার আবছ, সে আপনাকে আর এক ভবিষৎ থেকে অদ্য নিরীক্ষণ করে, ... - এ সকলই সদ্য মৃত কোনো জনের সমারোহ বা, আর যে, এই পুরুষোচিত ক্লান্তির

ক্ষেত্রে এ সকল যে, ম্রিয়মান, নিষ্ক্রিয়।' - এ গদ্য বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম মানে না। অথচ অনাস্বাদিত পূর্ব একটা ব্যঞ্জনা যে রয়েছে সেটাও ঠিক। তাঁর 'জল' গল্প থেকেই বাংলা গদ্য যে অন্য চালে চলতে শুরু করেছে বোঝা যায় কিন্তু বিষয় বস্তুও এই গল্পগুলিতে প্রধান হয়ে উঠেছে। 'মল্লিকাবাহার' যে ভাষা ব্যবহারের জন্য চমক সৃষ্টি করেছে তা নয়, বিষয় বস্তুতে ও তা অনন্য হয়েছে। এ গল্পে দেখা যায় দুই নারী পরস্পরের প্রতি শারীরিক আকর্ষণে আবদ্ধ হতে চেয়েছে। পুরুষে পুরুষে সমকামিতার কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সোনার চাঁদ' গল্পে। এ ধরণের বিষয় নিয়ে গল্প লিখে প্রখ্যাত উর্দু লেখিকা ইসমৎ চুঘতাই পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেটা কমলকুমারের 'মল্লিকাবাহার' নিয়ে হয়নি। তার কারণ 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই গল্প অনেকেই ধৈর্য ধরে পড়েন নি, পড়ার চেষ্টা করলেও অনেকে বোঝেন নি।'[২৪] এই গল্পগুলিতে পেইন্টিঙের মতোই তার ভাষা ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণ বিবরণ বা বিবৃতিকেও কত পুঙখানুপুঙখভাবে - ব্যক্ত করা যায় সেটা কমলকুমার দেখিয়েছেন - যেমন 'মল্লিকা বাহার' গল্পে - "আয়না এখন, আঁচল দিয়েই মুখ সে মুছে এবার যথাযথই প্রতিফলিত এবং অতীব স্পষ্ট। ... যথা তোরঙ্গ যথা ছেঁড়া মাদুর যথা পিতলের কাঁসার অকেজো তৈজসপত্র, এ সব আয়নায় আসে, আর আসে জানলার মুখোমুখি অন্য জানলা বহির্গত উর্ধ্বগামী বিপুল ধোঁয়ার চরিত্র - আয়নায় গভীরতা, আয়নায় অন্তরীক্ষ শূন্যতাকে পূরণ করেই, এ সত্য।"[২৫]

কমলকুমার তার গল্পে খুব সাধারণ আটপৌরে মানুষদের, তাদের বর্তমানতা - ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। আর সেজন্যই তার গল্পের নর-নারীরা কোথাও-ই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি তারা তাদের পরিবেশ, আচার আচরণ এবং মুখের ভাষা নিয়ে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পের ঘটনাতেও কোন ঘনঘটা নেই, অত্যন্ত ছোট ঘটনা নিয়েই গল্পগুলি সু সু ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন বন্যাপীড়িত গ্রাম্য সরল কৃষক উপান্তহীন

হয়ে লুটেরা হয় (জল) কোন সর্বস্ব খোয়া সহায়-হারা চাষী বিদ্রোহের খোয়াব দেখে (ভেইশ) অবশেষে অন্ধহেলায় প্রেম বঞ্চিত হয়ে সাধারণ একটি মেয়ে হয়ে ওঠে সমকায়ী। 'বাবার বাঁশঢালা কাশির আওয়াজ এবং মায়ের শতছিন্ন নোংরা কাপড় এবং দুজনের আকাশ বার্ধক্যে যে তুফানকে, অপরিসর উঠোনের টোকো গন্ধ, বালিখসা দেওয়ালের ঝুল যে তুফানকে কোনক্রমেই ক্ষুন্ন করতে পারেনি'[২৬] - সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে মল্লিকা ক্রমাগত লড়াই করতে করতে জীবনের তুফানকে উপভোগ করতে পারেনি। আয়না নিয়ে তার যে সাজসজ্জার বর্ণনা লেখক দেন তা যে ব্যর্থ অভিসারের প্রস্তুতি সেটুকু লেখক জানিয়ে দেন শুরুতেই। গল্পের শেষে তারই মতো আর এক ব্যর্থ নারী শোভনার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলায় মত্ত হয়, সোহাগ করে মল্লিকার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে তার মুখ চুম্বন করে শোভনা। মল্লিকা আবেশে বিহ্বল হয়ে যায়। শোভনার মুখ নিঃসৃত লালা মল্লিকার গালে লেগে থাকে। এ ভাবেই তারা স্বামী স্ত্রীর অভিনয়ে জীবনের স্বাদ নেয়।

কমলকুমারের প্রথম গল্প গ্রন্থ হল 'নিম অন্নপূর্ণা'। এতে ছিল মাত্র চারটি গল্প - 'নিম অন্নপূর্ণা', 'তাহাদের কথা', 'ফৌজ-ই বন্দুক' এবং 'মতিলাল পাদরী' - এভাবেই সাজানো ছিল, কোন কালক্রম মেনে সাজান হয়নি। কমলকুমারের প্রথমদিকে অধি অধিকাংশ গল্পই সমষ্টি জীবন নির্ভর। কিন্তু 'মল্লিকাবাহার', 'মতিলাল পাদরী' ও 'ফৌজ-ই-বন্দুক' - এই তিনটি গল্পে সমষ্টি মানুষের দ্বন্দ্বময় সংগ্রামী বিষয়কে পরিত্যাগ করে কমলকুমার ব্যক্তি মানুষের মনোগহনের সমস্যাকে গ্রহণ করেছেন। এই একই রকম বিষয় এবং টেকনিক দেখা যায় অনেক পরের 'গোলাপসুন্দরী' গল্পে। কমলকুমারের বেশিরভাগ গল্পই সৃষ্টি হয়েছে 'ভিড় নিয়ে, বা জনসমষ্টি নিয়ে বা ভূখন্ড নিয়ে। সেখান থেকে তার গল্পের সুবাদে একটা বা দুটি চরিত্র প্রধান হয়ে উঠে আসে। উঠে আসার পরও কিন্তু তারা সেই বৃহতেরই অংশ হয়ে থাকে।[২৭] অনেকটা অজন্তা পেইন্টিংসের

যতো। তার গল্পগুলি যেন ছবির কোনো অ্যালবাম, সেখানে পোর্ট্রেট নেই, সবই বড় বড় ছবি, অনেকখানি জায়গা ও অনেক মানুষ নিয়ে, কিন্তু মাঝে মধ্যেই আবার বড় ছবিটির বিশেষ থেকে বিশেষ কোন অংশের 'ক্লোজ আপ' হয়ে যায় 'কিন্তু যতিলাল পাদরী' কমলকুমারের গল্পে বিরল পোট্রেট'।[২৬] এই গল্পের পাদরী ভামরের শিশুকে গ্রহণ করতে চায় 'যিশু' হিসেবে। সেখানে সে পাদরি-গির্জা বাইবেল আর ভামরের শিশুর জীবনের আপাত অসংলগ্নতাকে উপেক্ষা করতে চায়। এই গল্পটি-পাদরির জীবনবোধের আর্তিতেই আর্দ্র হয়ে রয়েছে এই আর্তিই গল্পটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছে। 'আঙ্গিক বিষয় সন্ধানের দিক থেকে কমলকুমারের সবচেয়ে যাকে বলে ট্র্যাডিশন্যাল। বোধহয় এই অন্যতম কারণে এই গল্পটিই তার জনপ্রিয়তম। এর ট্র্যাডিশন - আনুগত্য আসছে পাদরির চরিত্রের অন্তর্গত মানবিকবোধের কেন্দ্র থেকে।'[২৯] এ গল্পে রয়েছে পাদরির একটি জন্ম পরিচয়হীন শিশুকে গ্রহণ করার দ্বিধাদ্বন্দ্বের কাহিনী। শেষ পর্যন্ত তার পাদরির মানবিক-তাই বড় হয়ে ওঠে এবং শিশুটিকে সে গ্রহণ করে। বিভূতিভূষণের 'আহ্বান' গল্পেও রয়েছে এভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে গ্রহণ করার কথা। 'যতিলাল পাদরী' এবং 'তাহাদের কথা' গল্প দুটিতে কমলকুমার সম্পূর্ণ নতুনরীতি অবলম্বন করেছেন। 'এতাবৎকাল সমস্ত কাহিনী লেখা হয়েছে ন্যারেটিভ স্টাইলে, ঘটনা পরম্পরায়। কিন্তু কমলকুমারের রচনায় যখন তখন অতীত বর্তমান-ভবিষৎ মিলে মিশে যায়। ... কমলকুমারের এই সব গল্পে, চরিত্র ও পটভূমির বাস্তব নিছক চাক্ষুষ বাস্তব নয়, মানুষগুলির মাথার পেছনে সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বদলে বদলে যায়। কমলকুমারের সংলাপের ব্যবহারও সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণবাক্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা নেই। এক একটি বাক্যের অর্ধেক কিংবা কয়েকটি শব্দেই সব বুঝিয়ে দেওয়া যাচ্ছে।''[৩০]

'তাহাদের কথা'(১৩৬৫ - দেশ ২০ ও ২৭ শে ভাদ্র) গল্পে দেখা যায় এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর (শিবনাথ) স্বপ্ন ভঙ্গের গ্লানিময়, নিঃসঙ্গ জীবনের কাহিনী। এই গল্পে

স্বাধীনতা সংগ্রামী এম.এ পাশ শিবনাথ স্বদেশী করার অপরাধে চাকরি থেকে বহিস্কৃত হয় এবং পাগল হয়। তার স্ত্রী হেমাঙ্গিনী যে এক সময় স্বামীর সঙ্গে স্বদেশীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সে শেষ পর্যন্ত স্বামীর পায়ে শৃঙ্খল পরায়। এই শিবনাথ একদিন দেশকে শৃঙ্খলমোচন করতে চেয়েছিল, ভাগ্যচক্রে তাকেই শেকল পড়তে হয়। কমলকুমার - এই গল্পের পুরো ঘটনা শিবনাথের শিশু পুত্র জ্যোতির চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বলা যায় জ্যোতির চোখকেই লেখক ক্যামেরার লেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন। জ্যোতি-ই একমাত্র তার বাবার পায়ে শেকল পড়ানোকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না এবং মা, দিদি - এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত হেরে যায়। জ্যোতি যখন ফিস্ হয়ে ওঠে তার মার বিরুদ্ধে তখন শিবনাথ বলে 'জ্যোতি মারিসনি' এবং লৌহের শৈত্য আপনকার গালে অনুভব করতে বলেছিল - খুব ঠাণ্ডারে খুব ঠাণ্ডা।" প্রকৃত স্বাধীনতাকামীদের স্বাধীনতা উত্তরকালে এ সান্ত্বনাই জুটেছিল 'খুব ঠাণ্ডারে খুব ঠাণ্ডা', যুগের এই ট্র্যাজিক তাৎপর্যকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতেই কমলকুমার গল্পের নাম করণ ও সমষ্টিবাচকতায় এনেছেন।

'তাহাদের কথা' গল্পটি হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে এর অনবদ্য আঙ্গিকের গুণে। দেশের জন্য সে শিবনাথ কারাবরণ করেছিল জেল থেকে বেড়িয়ে সে দেখল স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সমাজে আর কোন মূল্য নেই, সমাজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চলে গেছে কিছু অসৎ মানুষ, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে। এ গল্পের নায়ক ছোট বালক জ্যোতি, তার চোখ দিয়ে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে কাহিনীটি আরো মর্মস্পর্শী হয়েছে। সমগ্র গল্পটি জুড়ে রয়েছে একটি বালকের অভিমান। গল্পে কঠোর বাস্তবের পাশাপাশি রয়েছে কবিত্ব, যেখানে দেখা যায় আত্মারাম যারোয়াড়ি নীলকণ্ঠ পাখিকে উড়িয়ে দিয়ে বলে -

> আকাশ পাবি গো, ডর কিরে, আর জন্মে আমায় আকাশ দিবিস গো পরান ... একটি নীল স্পন্দন, মনের কিছু ভাগ বনের কিছু ভাগ দিয়ে গড়া নীলকণ্ঠ পাখি।

নীলকণ্ঠপাখির প্রসঙ্গ রয়েছে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে আবার কমলকুমারের 'তাহাদের কথা'তে। কিন্তু এই নীলকণ্ঠপাখি দুটি গল্পে দুটি ভিন্ন আবহের সংস্কার করেছে। 'বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে পাখিটি যেন অনেকাংশেই প্রকৃতির বিপুল সংগ্রহশালা থেকে খুঁজে পাওয়া একটি চমৎকার, তবে প্রকৃতিমূলক অনুষঙ্গ নিছক না হয়েও তা প্রধানত প্রকৃতি মূলক কেননা, বনজ উদ্ভিদ যেমন, সেও তেমনি থেকে যায় গ্রামের অর্থাৎ মানব সংস্কৃতির নাগালের বাইরে : পরিত্যক্ত কুটির মাঠে। অন্যদিকে, কমল-কুমারের নীলকণ্ঠ পাখিটিকে যা মনের কিছু ভাগ, বনের কিছু ভাগ দিয়ে গড়া, আমরা ঝুঁকে পড়তে দেখি মানব সংস্কৃতির দিকে যা মানস নির্মাণ, অতঃপর বিমানকারী, তাকে উড়ে যেতে দেখা যায় সংস্কৃতির এক দুরূহতম নির্মাণে তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে।'[৩১] 'তাহাদের কথা' গল্পে কমলকুমার মুক্তি কামনার যে স্বপ্ন, তাকে প্রতীকিত করেছেন শৃঙ্খলিত নীলকণ্ঠ পাখির প্রসঙ্গ এনে। এ গল্পের কঠোর বাস্তবের পাশাপাশি রয়েছে যে কবিত্ব তা গভীর বেদনাবোধ জাগায়।

'তেইশ' গল্পের আলম শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একা লড়াই করে উঠতে পারে নি। কিন্তু 'কয়েদখানা'(১৩৬৬) গল্পের শাহাদ সেই লড়াই-এ সমর্থ হয়েছে। কমলকুমারের প্রথম পর্বের গল্পগুলির মধ্যে একটি অত্যন্ত নিখুঁত, সুন্দর জোরালো গল্প 'কয়েদখানা'। কমলকুমার একজন শিল্পী তাই তার গল্পের বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখনী হয়ে উঠেছে রঙের তুলি। 'কয়েদখানা' গল্পে এ ধরণেরই ছবি রয়েছে -

> টিলার লোকটি তাকে দেখলো। লোকটি ঢ্যাঙা, পুরুষকারে দৃপ্ত আড়া, কঠোর মুখের তলে অল্প হিসেবি তীরেনা দাড়ি। মাথায় ছোট গামছার ফেটি, তার গায়ে নক্সা করা ভারি কাঁথা ঝুলছে। সব থেকে সুন্দর তার পদদ্বয়, মনে হয় কাঠেই কোঁদা করা হাঁটু - তার পাশেই আঁটলি মাংস পেশী। পা দুটি অনেক তফাতে রক্ষিত। কাঁথা গোল হয়ে উঠে গেছে কাঁধে।

- সব দৃশ্যই এরকম ছবি, পরিবেশের ইজেলে তেলরঙের আঁকা। এ গল্পের একদিকে রয়েছে ভূমিক অধিকারবোধ এবং অন্যদিকে বাবুশ্রেণীর শোষণের কাহিনী। 'কয়েদখানা' গল্পের মধ্যে দেখা যায় চাষীরা প্রথমক্ষেত্রে নীরবে জমিদারের হুকুম মেনে নিলেও একটা পর্যায়ে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এ বিদ্রোহ আর 'তেইশ'এর আলমের একক বিদ্রোহের মতো নয়, এ বিদ্রোহ অনেক সংগঠিত। এ গল্পের কাহিনীটি উম্মোচিত হয়েছে বেশ ধীর লয়ে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির অত্যন্ত সাধারণ কিছু মানুষকে প্রথমে আনা হয়েছে। এদের কাছাকাছি গ্রামে যে নতুন জমিদার এসেছে তার জমিদারি হালচাল পুরো রপ্ত হয়নি। জমিদারি মেজাজ দেখাতে মাঝে-মাঝে বন্দুক তুলে শূন্যতাকে ভয় দেখায়। এ জমিদার ভাবে প্রজাদের দয়া দেখানো মানেই দুর্বলতা অতএব এই সব প্রজাদের পায়ের নীচে রাখতে হবে। আর সেজন্যই প্রজাদের সে জমিদার বাড়ির দর্শনীয় স্থান কয়েদখানাটা দেখে আসতে বলে এবং মাতলামির ঝোঁকে অকারণে শাহাদের ঘোড়াটিকে মারার প্রতিশোধ নিতে জমিদারকে হত্যা করেছে। গল্পে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রিত দল-ই শাহাদের সঙ্গী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে এ পর্যায়ের কিছু গল্পে 'কমলকুমার আশ্চর্য রকম অসাম্প্রদায়িক'। বেশ কিছু হিন্দু মুসলমান চরিত্র এসেছে, এমন স্বাভাবিক ভাবে তারা মিলে মিশে আছে যে তাদের আলাদা করে চেনাই যায় না।'[৩২] যেমন 'জল' গল্পে বা 'কয়েদখানা' ইত্যাদিতে। এই গল্পগুলির মানুষের একই ধরনের দরিদ্র যাদের হিন্দুত্বে মুসলমানত্বে কোন তফাৎ ঘটে না। কয়েদখানা গল্পে জমিদার বাবু ঘোষণা করেছে 'এটা কাঁদবার জায়গা নয়' এবং কাল সকালেই যেন দখল হিসাব সবাই দিয়ে যায় - না হলে কয়েদে পরতে হবে।'[৩৩] কিন্তু এদের দারিদ্রের খেসারত দিতে করতে চোখের জল ফুরিয়েছে। তাই তাদের কণ্ঠে 'ওহো হো' ছাড়া আর কোন শব্দ ছিল না।'[৩৪] কিন্তু এই দুর্বল

মানুষেরাও যে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে কমলকুমার এ সত্য জেনেছিলেন স্বাধীনতা পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে। এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির নাগাতার আন্দোলন ১৩৬৬ সালে রচিত কয়েদখানা গল্প রচনার প্রেরণা হতে পারে। তিনি যে কিছুটা বামমনস্ক ছিলেন সেটা পরবর্তী কালে Now পত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি চিঠি থেকে জানা যায়, যেখানে নিজেকে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থক বলে ঘোষনা করেছেন -

> I am a Zealous admirer of U.F.Govt. and I shall continue to be so as long as they are on the right track.[৩৫]

'জল', 'তেইশ', 'কয়েদখানা' - ইত্যাদি গল্পগুলির পর কমলকুমার ভূমি-সংলগ্ন আন্দোলন কেন্দ্রিক বিষয় থেকে কিছুটা সরে আসতে থাকেন। 'তেইশ' গল্পে আলয় বিদ্রোহের জন্য সংগঠিত হয়ে উঠতে চায়, 'কয়েদখানা' গল্পে শাহাজাদ বিদ্রোহী হয়ে সফল হয়েছে ঠিকই কিন্তু এ গল্পে কিছুটা সুবিরোধ লক্ষ্য করা যায়, কোন সংগঠন সেভাবে গড়ে না উঠেই আন্দোলন হয় এবং চাষীরা সফল হয়। কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে কমলকুমার অন্ত্যবাসী মানুষদের নিয়ে গল্প লিখলেও তাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কে সে রকম ধারনা তাঁর ছিল না। সেটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছুটা ছিল, যা 'হারানের নাতজামাই' বা 'ছোটবকুলপুরের যাত্রী' ইত্যাদিতে দেখা যায়। সেকারণেই কমলকুমার ক্রমশ এ বিষয় থেকে সরে আসতে থাকেন। এই পর্বে আরো যে গল্প রয়েছে তাদের মধ্যে 'নিমঅন্নপূর্ণা' এবং 'ফৌজ-ই-বন্দুক' উল্লেখযোগ্য।

'নিমঅন্নপূর্ণা'(১৩৬৭) গল্পের বিষয় হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্নাভাবে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি পরিবার। ঘটনায় কলকাতার একটি পরিবারকে গল্পের উপজীব্য করলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ সমস্যা শুধু-মাত্র একটি পরিবারের সমস্যা নয় সমগ্র সমাজেরই সমস্যা। অথবা বলা যায় বৃহত্তর

অর্থে সমস্ত নিম্নবিত্তের সমস্যা। এই মানুষের সৃষ্ট অভাবে মানুষই যে কতখানি অসহায়, এবং মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, মূল্যবোধের ভিত সরে যাচ্ছে, তা অসীম মমতায় লেখক 'নিমঅন্নপূর্ণা' গল্পে দেখিয়েছেন। অন্নাভাব থাকলেও মা নিজেদের হাভাতের দলের সঙ্গে নিজেদের মেশাতে চায় না তাই মেয়েদের চোকর সেধ করে বোঝায় তা ভাতের চেয়ে ভাল, কিন্তু ও পাড়ায় যাতে মেয়ে না বলে সেটাও সাবধান করে দেয়। সমস্ত অবস্থার জন্য যে মানুষের সৃষ্ট যুদ্ধই দায়ী - এই কঠোর অথচ চরম সত্য বাস্তবটুকু লেখক বুঝিয়ে দেন একটি প্রসঙ্গে - সুখীর পাখির জন্য রাখা ছোলা চুরি করে খাওয়াকে কেন্দ্র করে মা প্রীতিলতা এবং সম্বল খেতুর মা - যখন পরস্পরের মুখোমুখি তখন 'এ হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গী বিমান উড়ে গিয়েছিল।' কিন্তু এই প্রীতিলতা-ই বৃদ্ধ ভিখারিকে হত্যা করে তার চাল সংগ্রহ করে প্রীতিলতা তার সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে ধরে বলে 'নে খা তোরা'। এই শ্রেণীর মানুষদের আত্মপ্রবঞ্চনা এবং সমস্ত মূল্যবোধের অনিবার্য মৃত্যুকে লেখক প্রকাশ করেন এই উক্তির মধ্যে দিয়ে। এই গল্পের সঙ্গে কমলকুমারের পূর্ববর্তী লেখক তারাশঙ্করের 'অগ্রদানী'র তুলনা চলে। কিন্তু অগ্রদানীতে নিজের পুত্রের পিন্ড আহার করে বেঁচে থাকার চেয়েও নিম অন্নপূর্ণার মানুষদের বেঁচে থাকা আরো মর্মান্তিক আরো ভয়ংকর। যে অন্নপূর্ণার কর্তব্য নিরন্নকে অন্নদান করা সে অন্নপূর্ণা-ই আর এক ভিখারিকে হত্যা করে অন্ন দাত্রী তথা নিম-অন্নপূর্ণা হয়ে ওঠে। কমলকুমার তার সমকালে রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে নির্ভর করে যে গল্পগুলি লিখেছেন 'নিমঅন্নপূর্ণা' হয়তো তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা। গল্পটির পরিসমাপ্তিতে পাঠক অনুভব করে এই সময়কার মানুষেরা ভয়ংকর এক সংকটের মুখোমুখি দাড়িয়ে আছে।

'ফৌজ-ই-বন্দুক'(১৩৬৭) গল্পটিতে রয়েছে একটি বিমূর্ত প্রেমের কাহিনী। ত্রিযামগত যুদ্ধের বিস্ফোরণ এবং জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে থাকা সৈনিক

করতার সিং পালঙ্কে শায়িতা রং মশালের ফোয়ারার মত একটি নারী আবিষ্কার করে যার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। প্রথমে ফৌজটি এই কল্পনার রমনীকে ভালবাসে এবং নিজের ভালত্বকে প্রমাণ করতে ঘর থেকে চলে যায় তাকে স্পর্শ না করে। পরে ঘরে ঢুকে সেই রমণীর অন্তর্ধান সহ্য করতে পারে না এবং পাগলের মতো চিৎকার করে বলে 'আই লাভ ইউ' এবং তার ভেতরের 'বদরাগী নাম্বারওয়ালা ফৌজকে সে আর ধরে রাখতে পারল না। হাতের বন্দুক উঠে এল, খুট করে শব্দ হল এবং দেয়ালের মেয়েটির আলেখ্য ঝাঝরা হয়ে গেল।'[৩৬] এই গল্পে দেখা যায় মানুষের মর্মস্থলে যে ভালবাসা বাস করে তাকে মানুষ পেতে চায় কিন্তু সে যখন দূরের বস্তু হয়ে ওঠে তখন মানুষের ক্রোধ জাগে। এই ভালবাসা এবং ক্রোধের সংমিশ্রিত রূপ ধরা পড়েছে এই গল্পে। এই গল্পের লক্ষণ সম্পর্কে অমিতাভ দাশগুপ্ত বলেছেন -

> ... আমাদের শোণিতে 'To rape the beauty'র হীনমন্যতা কখনই যে মরে যায় না তারই একটি বিমূর্ত নান্দনিক রূপ যুগপৎ মরুভূমি ও বৃষ্টির গন্ধ নিয়ে 'ফৌজ-ই-বন্দুক'-এ এসেছে।[৩৭]

এই পর্বে 'মল্লিকাবাহার', 'মতিলাল পাদরী' এবং 'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্পগুলিতে ব্যক্তি সমস্যা তাদের আশা আকাঙখা-ই প্রাধান্য লাভ করেছে। এ সব গল্পের মানুষেরা ও একটু ভিন্ন গোত্রের যাদের সঙ্গে 'জল' 'তেইশ' 'কয়েদখানা', 'তাহাদের কথা' বা 'নিমঅন্নপূর্ণা'র মানুষদের ঠিক মেলানো যায় না। এই সব গল্পগুলিতে রয়েছে সমষ্টি মানুষের সংকট, তথা সমাজে সংকট-সমস্যার কথা, এবং গল্পের মানুষেরাও প্রধানত নিম্নবিত্ত বা ভেঙ্গে পড়া মূল্যবোধের মধ্যবিত্ত মানুষ। লক্ষনীয় হল কমলকুমারের এই সময়ে লেখা উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা'তেও রয়েছে সমাজের সমস্যার কথা যেখানে বিদ্রোহী হয়েছে সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মের বিরুদ্ধে এক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ। শ্মশান চন্ডাল বৈজু চিতার এক কোণে প্রজ্বলিত কাঠের উপর হাড়ি বসিয়ে ভাত ফুটিয়ে নিতে দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এক সদ্য বিবাহিত নব-যৌবনা

নারীর সদ্য বৈধব্যের ও তার সহমৃতা হওয়ার সম্ভাবনায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিতে এই মৃত্যুর সম্ভাবনাকে সে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধে উদ্যত হয়।'[৩৮] অর্থাৎ ছোট গল্প এবং উপন্যাসে এই সময়ে একই শ্রেণীর মানুষের কথা এসেছে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে।

মানুষের নৈতিকতা এবং মনজাত সংকট কেন্দ্রিক গল্পে আড়ষ্ট দেখি 'মল্লিকাবাহার'(১৩৫৮)-এ অবশ্য কোন কোন সমালোচক 'মল্লিকাবাহার'এ খানিকটা শ্রেণী সমস্যা রয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু 'মতিলাল পাদরী'তে রয়েছে সম্পূর্ণ ব্যক্তি সমস্যার কথা। এরই সার্থক রূপ দেখা যায় 'গোলাপসুন্দরী'(১৩৬০) গল্পে। সমষ্টির সমস্যা থেকে কমলকুমার যেমন ব্যক্তি সমস্যার দিকে ঝুঁকেছেন তেমনি গল্পের পটভূমির ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সমষ্টি কেন্দ্রিক মানুষের সমস্যা গড়ে উঠেছে গ্রামাঞ্চল বা শহরতলীকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে ব্যক্তি সমস্যার কাহিনীর পটভূমি হয়েছে কলকাতা বা অন্যকোন নাগরিক পরিমণ্ডল। 'গোলাপসুন্দরী' গল্পের বিলাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ভালবাসাকে অবলম্বন করে, সুস্থ হয়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিশ্রাম নিতে এল, কিন্তু সেখানেই তার মৃত্যু ঘটল। গল্পের প্রথম পর্যায়ে লেখক স্যানাটেরিয়ামের নিখুঁত বর্ণনায় মৃত্যুর এক কবিত্বময় বাস্তবতাকে রূপ দিয়েছেন। এ গল্পের বিলাসের মৃত্যু কল্পনার উদ্রেক করলেও তা ট্র্যাজিক হয়ে ওঠে না। জীবন মৃত্যুর রহস্যময় জগৎ-এ চেটি-রই উপলব্ধি হয়েছিল যে সমস্ত ক্ষনস্থায়ী। তাই সদ্য সুস্থ হয়ে ওঠা বিলাসের কাছে যে বুদ্ধ সুন্দর, উজ্জ্বল, বাবু, অভিমানী আশ্চর্য।[৩৯] বলে মনে হয়, সেই বুদ্ধ চেটি-র কাছে হয়ে ওঠে - 'ইহা চলন্ত নিদ্রা অথো ভাষ্যমান এপিটাফ।'[৪০]'গোলাপ সুন্দরী' গল্পের আগে 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসে লেখক মৃত্যু সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী - মৃত্যুই

জীবনের শেষকথা নয় আত্মা দেহ পরিবর্তন করে মাত্র, - এই দার্শনিক বোধ 'গোলপ 'গোলাপসুন্দরী' গল্পেও এসেছে। কিন্তু 'গোলাপসুন্দরী' গল্পে অনেক কেন'র উত্তর-ই পাঠক খুঁজে পান না, তাই গল্পে প্রথম শ্রেণীর উপদান এবং পরিকল্পনা থাকলেও গল্পটির ট্র্যাজিক মহিমায় উন্নীত হয়। দেবেশ রায় বলেছেন -

> অত কিছু সত্ত্বেও বিলাস তো কোনো কিছুরই প্রতিনিধি নয়। এমনকী তার নিজেরও নয়। এমনকী, প্রতিনিধিত্বের যে প্রভাব আধুনিকতার একটি উপাদান হয়ে উঠতে পারে বিলাসে সেই অভাবও কোন আত্মসচেতন যাথার্থ্য পায় নি। তাই বিলাসের আসক্তি ও আসক্তি থেকে মৃত্যু কোনো ব্যক্তিগত দুঃখও জাগায় না।[৪১]

কিন্তু অন্যতম সমালোচক বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন -

> এই ত্রিমাত্রিক স্তর পরম্পরা (জীবন-মরণ-সুন্দর ইত্যাদি) মূল রচনা থিমেটিক ঐক্যকে কোথাও ক্ষুন্ন করেনা[৪২] 'গোলাপসুন্দরী' গল্পের পর থেকেই কমলকুমার এক নতুন পথে যাত্রা করেছেন। 'গোলাপ সুন্দরী ও অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশের পর তরুণ লেখকদের মহলে যখন হুলুস্থুল পড়ে গেছে অনেকে তাকে কাল্ট ফিগারে পরিণত করতে চায় তখনই কমলকুমার সরে গেলেন এই সুন্দর রচনারীতি থেকে। তিনি যেন পাঠকদেরও চান না।[৪৩]

কমলকুমারের রচনায় একটা পর্যায় থেকে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবর্তন মূলত ভাষা ব্যবহার এবং বিষয় নির্বাচনে। 'রুক্মিনী কুমার' এবং 'লুপ্ত-পূজাবিধি' থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র

যে ধরণের সাধুভাষার প্রয়োগ করেছেন তার সরলীকরণ ঘটে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রে এসে। প্রমথ চৌধুরীর উদ্যোগেই চলিত গদ্যের ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। লিখিত ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য দেবার জন্য চলিত ক্রিয়াপদকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও গ্রহণ করেছেন। এর পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই প্রথম জীবনে সাধুভাষায় লিখেছেন, এই শিল্পীরা ন্যারেশনে সাধু এবং সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। জগদীশ গুপ্ত, সতীনাথ ভাদুড়ীও প্রথমে সাধুভাষায় লিখে পরে চলিত গদ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কমলকুমার বাংলা সাহিত্যের একমাত্র লেখক যিনি প্রথমে চলিত গদ্যে লিখে হঠাৎ করেই সাধু গদ্যে লিখতে শুরু করেন।

'গোলাপ সুন্দরী' গল্পের পর থেকেই কমলকুমারের গল্পের পাত্র-পাত্রীর শ্রেণী অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে। তার প্রথম দিকের গল্পের মানুষদের শ্রেণীগত অবস্থান ছিল শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এর পরবর্তী গল্পেই শহরের এলিট শ্রেণীরাই অধিক প্রাধান্য পাচ্ছে। শহরের অবকাশজীবী মানুষদের অসংগতিকেই বিভিন্ন দিক থেকে লেখক দেখাতে চেয়েছেন। এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'রুক্মিনীকুমার', 'লুপ্ত পূজাবিধি', দ্বাদশ মৃত্তিকা', 'অজ্ঞাতনামার নিবাস', 'কঙ্কাল এইনজি' 'আমার চোখের জল', কালই আততায়ী', 'অনিত্যের দায়ভাগ', 'স্বাতি নক্ষত্রে জল' ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে খেলার বিচার', 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'খেলার আরম্ভ'। 'বাগান' সিরিজে তিনি কিছু গল্প লেখেন - 'বাগান দৈববানী', 'বাগান কেয়ারি' 'বাগান পরিধি' ইত্যাদি। কমলকুমারের প্রথম দিকের গল্পগুলির মধ্যে 'কয়েদখানা' এবং দ্বিতীয় পর্বের গল্পের মধ্যে 'রুক্মিনীকুমার' - এ দুটির মধ্যে প্রকাশ কালের ব্যবধান আট বছর। কয়েদখানার প্রকাশকাল ১৩৬৬, রুক্মিনীকুমার ১৩৭৪-এ প্রকাশিত। এর মাঝে প্রকাশিত হয়েছে, অন্তর্জলী যাত্রা, 'অনিলাস্মরণে' ও 'সুহাসিনী পয়েটম' - এ তিনটি রচনাই প্রচলিত অর্থে সাধুভাষায় রচিত। অর্থাৎ বলা যায় ১৩৬৬-র পর কমলকুমার তথাকথিত চলিত ভাষা পরিত্যাগ করেছেন। 'কিন্তু তথাকথিত চলিত ও সাধু-ভাষার মধ্যে পার্থক্য তো ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ফেরে এবং বলা বেশি যে কেবলমাত্র

ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ক্ষেত্রে ভাষার কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় না।"[৪৪] কমলকুমারের ১৩৬৬র আগে লেখা গল্প এবং পরবর্তীকালের লেখা গল্প থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে ভাষার তুলনা করা যেতে পারে। -

> ... তা দিয়েও কিছু চাল পেয়েছে, কিন্তু এখন শূন্য,
> যেমন আছে - এই ভাবে যত্নসহকারে তবু সে চতুর্দিকে
> চেয়েছিল। ল্যাম্পের আলোয় তার হাতটা সে দেখেছিল,
> শীর্ণ, পদদ্বয় - তাই (জল)। - 'শীর্ণ' এখানে শীর্ণ
> হাত পাঠক ঠিক দেখে না, আখ্যাত চরিত্রটির শীর্ণ
> হাতটিকে দেখা ক্রিয়াকে পাঠক দেখতে পান। [৪৫]

'রুক্মিনীকুমার' এবং 'লুপ্তপূজাবিধি' গল্পে রয়েছে যেমন -

> এ যাবৎ এই অস্ত্রটি তাহাকে পীড়িত করিয়াছে, ইহা অনুপস্থিত
> কাহারও অবমাননায় ক্রূর, উপরন্তু আপন আত্মসচেতনাতে
> আঘাত হানিয়াছে, যে পুরুষকার ঊর্ধ্বমুখীন যাহাকে ইদানীং
> রক্ত উদ্গারের বিভীষিকার মধ্যে সবে মাত্র চিনিয়াছে -
> তাহাকেই যেমন বা বিদ্রূপ নিমিত্তে বর্তমান'[৪৬]।

> গ্রামাঞ্চল বলিতে ঐ বালকটি যাহার ভ্রূতে সূচীমুখ দাগ, তাহার
> চোখের পাতা বারম্বার উঠানামা করিল - ইহাতে বুঝায়
> চিমনীর ধোঁয়া যাহা ক্রমে বিলীয়মান তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে।[৪৭]

- এখানে দেখা যায় 'সঠিক শব্দবাছাই ও শব্দের সংস্থান ও ধ্বনিগত তাৎপর্য বিষয়ে মনস্ক ও মরিয়া সচেতনতায় এই ভাষা ক্রমে রূপ নিয়েছে।'[৪৮] সাম্প্রতিক কালের ছোট-গল্পিকার ভগীরথ মিশ্র বলেছেন যে উৎকৃষ্ট পদ্য হবে সেই আলো যা হিরের শরীরে

পড়াযাত্রই ঝিলিক তোলে নিমেষে, ... শব্দব্রহ্ম। সুচারু ব্যবহারে সে অপীম শক্তির অধিকারী হয়ে ওঠে। ... ভাষার শক্তি তার দুর্বোধ্যতায় নয়, ভাষার শক্তি তার রহস্যময়তায়।" [৪৯] - কমলকুমারের গল্পে সেই রহস্যময়তাকে খুঁজে দেখা প্রয়োজন, যা কখনই দুর্বোধ্য নয়। দয়াময়ী মজুমদার কমলকুমারের স্মৃতি চারণায় বলেছেন যে একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন এই ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে - "লেখাটা যদি পড়বার জন্যে ছাপা হয়, আর সেটা যদি পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য হয় তাহলে ... ?" এর উত্তরে কমলকুমার বলেছিলেন যে লেখকদের পাঠক তৈরি করার একটা দায়িত্ব থাকে। [৫০] কমলকুমারের গল্পের বিশেষত্ব হল তার বলার ধরণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'আর্কেয়িজম যা তার ভাষাকে যুগপৎ ফ্লুয়িড ও ইরেকটাইল করেছে যা অনভ্যস্ত পাঠকের সহসা দুরূহ মনে হতে পারে।' [৫১] তাঁর গল্পগুলিতে এক দিকে রয়েছে বিশুদ্ধ সংস্কৃত তৎসম শব্দ, দ্যোতনাময় সংস্কৃত ঘেঁষা নতুন শব্দ ও সেই সব শব্দের অভিনব তাৎপর্যময় ব্যবহার অন্যদিকে একান্ত আটপৌরে সাহিত্যে অপ্রচলিত শব্দ, সেই সঙ্গে মাইকেলী রীতির ক্রিয়াপদ সৃষ্টি is বা are -এর অনুরূপ 'হয়' ক্রিয়াপদ ব্যবহার। তিনি, মানুষ যে স্তরে বা যেমন, যে পারিপার্শ্বিকতায় রয়েছে সে অনুযায়ী-ই ভাষা প্রয়োগ করেছেন যা তার সাহিত্যকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছে এবং প্রখর চেতনাবান করেছে। প্রথম পর্বের গল্পে দেখা যায় গল্পের বর্ণনা অংশে একভাষা এবং পাত্র পাত্রীদের কথোপকথনে তাদের নিজ নিজ ভাষা, কেননা ঐ ভাষাতেই বাহ্যবস্তুর অবিকলতা ও যুক্তি ধরা যায়। সুনীল গাঙ্গুলী তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন 'ভাষাকে এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি ?' উত্তরে কমল কুমার বলেছিলেন - দ্যাখ্যো, ভাষা নানা রকম হয়। একই ব্যক্তি দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করে। সকালে বাজারে গিয়ে একরকম ভাষা, বাবা মায়ের সঙ্গে আর এক রকম ভাষা, প্রেমিকার সঙ্গে অন্য ভাষা, ... সাহিত্য হচ্ছে সরস্বতীর সঙ্গে সংলাপের ভাষা তা আলাদা হতে বাধ্য।' [৫২]

কমলকুমারের প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের গল্পের আঙ্গিকে ভাষায় একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বিষয়ে কিছুটা সাদৃশ্য থেকে যায়। প্রথম পর্যায়ে 'তাহাদের কথা' গল্পে রয়েছে অসহায় স্বদেশী যুগের মানুষের কথা। আর একই বিষয় নিয়ে পরবর্তীকালে লিখেছেন 'রুক্মিনীকুমার'(১৩৭৫)। এ গল্পটির বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, আপাতভাবে এ গল্পকে মনে হতে পারে নিতান্তই ব্যক্তিক সমস্যা। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের বিশ্বাসভঙ্গ-বিষয়টি বিংশ শতাব্দীতে প্রকৃত পক্ষে কোন ব্যক্তি-বিশেষের সমস্যা নয়, বরং তা অনেকটাই একটি শ্রেণী সমস্যা। এদিক থেকেও 'তাহাদের কথা'র সঙ্গে রুক্মিনীকুমারের সাজুয্য রয়েছে। তবে 'তাহাদের কথা' স্বাধীনতা সংগ্রামী শিবনাথের সুপ্তভঙ্গের গ্লানিময় কাহিনী। রুক্মিনীকুমার গল্পের বিষয় 'অগ্নিযুগের দিগভ্রান্ত পথিক রুক্মিনীকুমারের যোগ ও ভোগের দ্বন্দ্ব'[৫৩] কমলকুমার 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীর চিত্র আঁকতে চাননি। তাই গল্পের প্রথম থেকেই গল্পের আবহ সৃষ্টি করেছেন কলকাতার দূষিত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে - 'কি ভয়ঙ্কর জীবনযাত্রা গুমট স্যাঁত স্যাঁতে জঘন্য সর্দিল অনুভব, রাত্রে কুকুরের ঘেয়োঘেয়ি, ইঁদুরের উপদ্রব, তৎসহ নর্দমার কুটগলিত শকুন খসী পঁচা ঘর্ম্মাক্ত গন্ধ, যেখানে রুগ্না ভিন্ন সকল স্ত্রীলোকই কামুকী, পুরুষেরা লম্পট।'[৫৪] এভাবেই গঙ্গাতীরের কলুষিত আবহাওয়া ট্রাম-ইনস্পেক্টার গোবিন্দবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রকাশ্যে নগ্ন অবস্থায় স্নান করা - ইত্যাদি কলকাতার নগর জীবনের সর্বাত্মক যৌনতার উপস্থিতি দিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে যুক্ত হয় সেই নগরেই বাস করা স্বাধীনতার শুদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবক রুক্মিনীকুমারের অন্তর্গত অস্ফুট রিরংসা। সে নিজে কুষ্ঠরোগ সংক্রমিত হয়েও "সে এখন লবঙ্গলতার সহিত রোগজীবানুতে রক্তে- মাংসে সে এক অদ্ভুত ইনসেস্টুয়াস বোধে সে চমৎকৃত।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিপ্লবী থেকে যায় এবং কলকাতার রাস্তায় পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। এ বিষয়ে রফিক কায়সারের মন্তব্য হলো -

> কমলকুমার এই গল্পে বিপ্লবের তত্ত্বকে অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রক্তমাংসের মানুষকে। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আরাধনাকে দূরে রেখে কমলকুমার তুলে ধরেছেন মানুষের জৈব প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনুপুঙ্খকে।[৫৫]

এই বক্তব্যের সমর্থন করে বলা যায়, কমলকুমারের বিভিন্ন গল্পের বিশ্লেষনে এই সত্যই উঠে আসে যে ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের আবেগ তার গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেনি বরং দেখা যায় বৈপ্লবিক আন্দোলনকে তিনি জীবনের নানা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন।

কমলকুমার দ্বিতীয় পর্বের গল্পে কাহিনীগত কাঠামো বর্জন করে কেবলমাত্র খিমকে গল্প করে তুলেছেন। 'নুতপুজাবিধি' গল্পে একটি প্রদর্শনীকে অবলম্বন করে দেখাতে চেয়েছেন যে গোটা ভারতবর্ষ কি ভয়ংকর দারিদ্র ও প্রাচুর্যে বিভক্ত। গল্পে দেখা যায় উচ্চ মধ্য বিত্ত সমাজের বালক বালিকাদের শিশুমৃত্যুর হার সম্পর্কে বোঝানো হচ্ছে চীনেমাটির পুতুল দিয়ে, শিশু মৃত্যুর কারণ অপুষ্টি এবং অনাহার - এ দুটি বিষয় ঐ বালক বালিকাদের কাছে অজ্ঞাত। গোটা প্রদর্শনীই যে কিভাবে হাস্যকর এবং ব্যর্থ হয়ে ওঠে তা কমলকুমার তির্যকভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। এই শ্রেণী বালিকার সৌন্দর্য প্রীতিকেও তিনি কটাক্ষ করেছেন -

> ঐ ফুল বজ্র বা সরলরেখা ধরিয়া পড়ে নাই, জিগজাগ ভাবে পতিত হয়, অজস্র মুক্তির গায়ে আঘাতের দরুনই তাহা ঘটে।[৫৬]

এই কৌতুক এবং কটাক্ষ আরো স্পষ্ট হয়েছে 'দ্বাদশমৃত্তিকা', স্বাতিনক্ষত্রে জল' - গল্পে। এই গল্পগুলিতে উচ্চবিত্ত সমাজের মানুষদের জীবনের শূন্যগর্ভ আস্ফালনকে এবং কৃত্রিম-জীবনের চিত্রকে দেখিয়েছেন যেখানে মানুষেরা পরিচিত হয়ে যায় কিছু সাংকেতিক

শব্দের মাধ্যমে - 'মিঃ' অথবা 'মিসেস' বা 'র' বাবু ইত্যাদিতে মানুষ ক্রমশঃ নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলছে, এবং একেই আধুনিকতার নামাবলী পড়াতে চাইছে। এই শ্রেণীর মানুষদের শিশু প্রতিপালন এবং শিক্ষাকে কমলকুমার কুসংস্কার হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। 'স্মৃতিনক্ষত্রে জল' গল্পে রয়েছে অভিভাবকের পদমর্যাদা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিশুমনের উপর চাপান হয় যার ফলে অসংখ্য শিশুমন পরাস্তরে হত্যা করা হয়। গল্পটির নাম সম্পূর্ণই সাঙ্কেতিক। গল্পের কাহিনীকে বাদ দিয়ে থিমকে গুরুত্ব দেওয়াতে কতগুলি বৈশিষ্ট্য এই পর্বে দেখা যায় যেমন এই গল্পে উপমা ব্যবহার 'অসম্ভব নির্জনতা গোঙার হইতে লাগিল'(স্মৃতি নক্ষত্রে জল) কিন্তু আগের গল্পে উপমা ব্যবহার অন্যরকম 'ঘোড়াটির ঘাড় যেমন বা মাছ পড়া ছিপ'(কয়েদখানা)।

প্রথম পর্যায়ের গল্পে কমলকুমার দরিদ্র মানুষদের অসহায়তা দেখিয়েছেন কৃষক আন্দোলনের বা স্বাধীনতা সংগ্রামের বা বিশ্বযুদ্ধের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে। সেখানে সমষ্টি জীবনের সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে কাহিনীর থেকে থীম প্রাধান্য পেলেও বা ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রধান হয়ে উঠলেও সেখানে রয়েছে শহরের অভিজাত শ্রেণী বনাম দরিদ্র মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কমলকুমার তার সাহিত্য রচনার মূল লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত স্থির ছিলেন, মাঝখানের কিছু ব্যক্তি সমস্যা কেন্দ্রিক গল্প বাদ দিয়ে। চরিত্রগুলোতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি না করে শ্রেণী হিসেবেই দেখাতে চেয়েছেন সেজন্যই ব্যবহার করেছেন 'র' বাবু ইত্যাদি বিশেষভঙ্গী, এক্ষেত্রে গল্পে সংলাপগুলিও ব্যবহার করেছেন সাধু গদ্যে। অর্থাৎ সংলাপও আর চরিত্রগত না হয়ে থিম নির্ভর হয়ে উঠেছে, যা 'বাস্তব না হলেও অবাস্তব হল না। বিষয়ের অন্তর্গত এক অমোঘ বাস্তবতা উঠে এল এই গল্পগুলির সংলাপের ভাষায়।'[৫৭]

কমলকুমার 'খেলা' এবং 'বাগান' এই ক্রম দিয়ে বেশ কিছু গল্প লেখেন। 'খেলা' নাম দিয়ে তিনটি গল্প এবং একটি উপন্যাস রচনা করেন। কমলকুমার 'লেখা বিষয়ক' নিবন্ধে বলেছেন 'খেলা' ও 'বাগান' এই ক্রম দিয়া অনেক লেখা লিখিয়াছি ইহাতে 'খেলা'তে সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনা সকলে মানুষের সূক্ষ্মতা আর 'বাগান' - এতে মানুষের সম্পর্কবোধ 'সূক্ষ্মতা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।'[৫৮] বাগান সিরিজ সম্পর্কে তিনি একটি চিঠিতে বলেন যে মানুষের সম্পর্কবোধ ভালবাসা কীভাবে 'নয়ছয়' হয় তাই'[৫৯] তাই বাগান সিরিজের বিষয়। এই সিরিজের প্রায় গল্পেরই বিষয় 'কুটনৈতিক সম্পর্কবোধ বা বাপ-বেটা মা-ছেলে ভাইবোন, বর-বৌ সবাই।'[৬০]'খেলা' এবং 'বাগান' - এই ক্রমের গল্পগুলির আগে 'শ্যামনৌকা' নামে একটি গল্প রচনা ১৩৭১-এ। এ গল্পে যে মৃত্যুচেতনা এবং জীবনের প্রতি আসক্তি রয়েছে তার সঙ্গে 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের কিছু সাদৃশ্য রয়েছে - যেখানে কালাচাঁদ বলছে - "পৃথিবীতে আবার যদি আসি, আমি আসবোই ... ভালবাসা দিও ...। আর 'অন্তর্জলী যাত্রা'তে রয়েছে সীতারাম বলছে "বউ তুমি আছ বলে বড় বাঁচার সাদ হচ্ছে।" অথবা সীতারাম যশোবতীকে যেখানে বলছে - 'এ জীবন গেল কি হয়েছে ? আবার জন্মাব, আবার ঘর পাতব।'

কমলকুমার 'খেলা' সিরিজ দিয়ে বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন সেটা তার কিছু চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। চতুরঙ্গ সম্পাদককে এ বিষয়ে লিখেছিলেন -

> আমার কাছে একটি লেখা আছে তাহা প্রায় আপনার কাগজে ১০০-পৃষ্ঠা হইবে। গল্পটি নকশাল বিষয়ে আমাদের প্রেম। গল্পটার নাম 'খেলার অপসরা' ...।[৬১]

আর সাময়ের আনোয়ারকে লিখেছেন 'খেলার মীমাংসা ৫০ পৃষ্ঠা কপি করিয়াছি।'[৬২] এছাড়া নির্মাল্য আচার্যের একটি চিঠি থেকে জানা যায় কমলকুমারের কাছে একটি

গল্প ছিল যার নাম খেলার তারিখ।'[৬৩] কিন্তু চিঠিতে উল্লেখিত একটি গল্প ব্যতীত অন্য কোন গল্প সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না, এবং পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। কমলকুমার একসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং 'খেলা' সিরিজের কিছু গল্পের শুরুতে রামকৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে। 'খেলার বিচার' গল্পের আউন্ড এ রকম 'মাধবায় নমঃ, তারা ব্রহ্মময়ী মাগো জয় রামকৃষ্ণ। ঠাকুর করুন যাহাতে আমরা অতীব গ্রাম্য - আমাদের নিজস্ব জীবনের ঘটনা সরলভাবে লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি।'[৬৪] 'খেলার দৃশ্যাবলী', 'অনিত্যের দায়ভাগ' গল্পগুলির আরম্ভ এরকম। এই সিরিজের গল্পে যে বিষয়গুলি এসে যায় তা হল নকশাল আন্দোলন, বিচার ব্যবস্থার প্রহসন, অথবা বিশুদ্ধ গ্রাম্য জীবন। এই গল্পগুলি থিম সম্পর্কে কমলকুমার অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন - তার মতে 'খেলা'তে সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা সকলে মানুষের সূক্ষ্মতা চিত্রিত হয়েছে। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'কালই আততায়ী' (১৯৮০) এবং 'মামলার শুনানী' (অপ্রকাশিত অসম্পূর্ণ গল্প)। এদের বিষয়ও নকশাল আন্দোলন। সেদিক থেকে গল্পগুলিকে খেলা সিরিজের গল্পই বলা যেতে পারে। 'খেলা আরম্ভ' গল্পে রয়েছে 'নকশাল আন্দোলন' সম্পর্কে আমাদের সেই প্রেমের কথা যা অত্যন্তই হাস্যকর। একশ্রেণীর মানুষ যারা বরাবরই আন্দোলনের বাইরে থেকে গা বাচিয়ে চলে তাদের কাছে 'আন্দোলন কথাটা কত না ভালবাসি ... কেমন দারুণ মিষ্টি।'[৬৫] এই গল্পটির শেষে কমলকুমার একটি চিঠিতে লিখেছেন - 'গল্পের রগড় পাইবে - গল্পের যন্ত্রণাতে যাইবেক না।'[৬৬] কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি গল্পটিতে যন্ত্রনাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন। এই অন্ধকার যুগের আততায়ী যে 'কাল'ই সেই অনুভব দেখা অন্য একটি গল্প 'কালই আততায়ী'তে। 'খেলার দৃশ্যাবলী' গল্পে দেখা যায় বিচার ব্যবস্থা কিভাবে প্রহসনে পরিণত হয়েছে, কমলকুমার ব্যঙ্গের ছলে বলেছেন 'বিচার যাহারা করিবেন তদীয় পরচুলার নীচে চমৎকার বাগিচা করা টেড়ী ছিল।'[৬৭]

এই গল্পে যে যুবকটি জেলে আছে, তার জেলে যাবার পেছনে যে বাস্তবতা রয়েছে পাঠককে লেখক সুকৌশলে সেদিকে নিয়ে যান। এই গল্পের 'সে' প্রকৃত পক্ষে পৃথকভাবে একক থাকে না অনেকের মধ্যে সে 'একটি নহে আর' - এই অনুভব জন্মে।

'খেলার বিচার'(১৯৭৮ কৌরব পত্রিকা সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) গল্পে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ গ্রামে এক বাড়ি থেকে ভূড়িভোজন করে ছাঁদা বেঁধে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে অসুস্থ হয়। তার দুই শিশুকে তখন সাহায্য করে এক 'গোবর কুড়ানী বুড়ি' যার সঙ্গে যোগ দেয় কাচে ডর দেওয়া এক জাত ভিখিরি কিন্তু অদূরে বসে থাকা তিনবাবু সাহায্যে অংশ নেয় না। এখানে দেখা যায় সমাজের যারা দরিদ্র বঞ্চিত তাদের প্রতি কমলকুমারের এক ধরণের সহানুভূতি আর সমাজের অন্য স্তরে থাকা তথাকথিত ভদ্র মানুষদের প্রতি তির্যক ব্যঙ্গ। কমলকুমারের পূর্বসূরী - মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পেও ছিল সমাজের নীচু তলার মানুষদের প্রতি এই সহানুভূতি এবং সমর্থন। দারিদ্র্যের জন্যই এই ব্রাহ্মণ ভোজন লোভী এবং সে ছাঁদাবাধাতে প্রবৃত্ত হয়। এই পর্যায়ের গল্পগুলিতেও রয়েছে কমলকুমারের সেই সমাজ-চেতনা। অর্থাৎ ভাষাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও লেখক তার ভাবনার মূল ধারাকে প্রথম থেকেই বজায় রেখেছেন। কিন্তু 'খেলা' সিরিজের মতো 'বাগান' সিরিজেও গল্পগুলিতে ভাষা অনেক জটিল এবং দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলির ক্ষেত্রেই ভাষার চক্রব্যূহ গড়ে উঠেছে। যা ভেদ করে সাধারণ পাঠক মূল রস গল্প গুলি থেকে আহরণ করতে পারে না।

আলোক সরকার 'কমলকুমার মজুমদার মানুষ ও ভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন 'ideal beauty' মালার্মের অনিষ্ট ছিল, রবীন্দ্রনাথের 'ভাবের স্বাধীন লোক', কমলকুমারের অনিষ্ট ছিল 'Ideal Man' উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়োজন মালার্মে কবিতাকে

স্বয়ং সম্পূর্ণ সংগীতের মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন, কমলকুমার ভাষার প্রচলিত অন্বয় ভেঙে এবং নির্দিষ্ট একক প্রতীক ব্যবহার করে তার 'Ideal Man' র জীবন যাপন। তার বিশুদ্ধতাকে অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন। কমলকুমারের ভাষার যে প্রাচীনগন্ধী রহস্যময়তা, মনে হয় তাও এই লক্ষ্যের প্রতি নিবিষ্ট। " ... আদর্শ মানুষের সরল অকপট জীবন যাপনের উপস্থাপনার প্রয়োজনে ভাষাকে অতিরিক্ত, এবং কখনো বা আপাত অপ্রয়োজনীয় অলংকার পরিয়েছেন। বিশুদ্ধ অকলুষ মানুষ রহস্যময় অকপট সরল মানুষের বর্ণনার তাগিদে এটা আবশ্যক ছিল।[৬৮]

কমলকুমারের ভাষা প্রসঙ্গে অবশ্য অনেকেই বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাদের অভিযোগের প্রধান সূত্রই হল যে কমলকুমারের লেখার বিষয় ও ভাষার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই এবং সে ভাষা জীবন চিত্রনে একেবারেই অচল। নবনীতা দেবসেন এই প্রসঙ্গে তার 'পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং অথবা সিদ্ধান্তশ্রিকের শব্দ সাধনা' প্রবন্ধে নানা অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন -

> মানুষে মানুষে যোগস্থাপনেই ভাষার উদ্দেশ্য তাই ভাষাকে নির্ভর করতে হয় কিছু সংখ্যক প্রতীকের উপরে। তার কাজ কেবল সংকেত সরবরাহ করাই নয়, তার অতিরিক্ত কিছু, এবং এই অতিরিক্ত অংশটুকু থেকেই ঘটে সাহিত্যের উৎসরণ। সাহিত্য মানেই সংগ, সংসর্গ, একক্রিয়াণ্বয়িতা, অখণ্ডতা। ... এর অর্থ ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। কমলকুমারের সাহিত্য এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ।[৬৯]

আবার বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত তার 'সেভাষা ভুলিয়া গেছি'[৭০] প্রবন্ধে কমলকুমারের ভাষা ভঙ্গির স্মরণীয়তা এবং বলিষ্ঠতার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন। রফিক কায়সার তার 'কমলপুরাণ' গ্রন্থে বলেছেন -

"এই সাধ্যভাষার কোন রকম সামাজিক কিংবা সাহিত্যিক ভিত্তিভূমি নেই। মিশনারী রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষার সঙ্গে কমলকুমারের গদ্যই আপাত লক্ষ্য করা গেলেও সাদৃশ্যের পরিমান স্বল্প এবং পরিমিত। কোন রকম সামাজিক ভিত্তিভূমি ব্যতিরেকে লেখকের খেয়াল খুশিতে এই ভাষা গড়ে উঠেছে।" [৭১]

কিন্তু কমলকুমারের জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম গবেষক হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের যুক্তি ভিন্নতর। তাঁর মতামতকে সমর্থন করেই বলা যায় যে - ভাষার প্রকৃতি হলো চলমানতা এবং সেটা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথে বা রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দে অথবা অতি আধুনিক যুগে প্রবাহমান। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষারও নব নব উন্মেষ ঘটে, আর সেই অনুসঙ্গে কমলকুমারের ভাষাভঙ্গিকে নবপ্রকাশ বলেই চিহ্নিত করা যেতে পারে। ভাষা নিয়ে এই বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মূলে তার লক্ষ্য ছিল 'ভাষার বর্ণনাত্মকতার সঙ্গে নানা আর্ট-ফর্মের অনুষঙ্গ ও সূক্ষ্মতা আরোপ এবং সেই সঙ্গে ভাষাকে রূপাত্মক করে তোলা।' [৭২] এছাড়া বলা যায় ব্যাকরণের নিয়মশৃঙ্খলাকে খানিকটা উপেক্ষা করে শব্দকে অনভ্যস্ত স্থানে বসিয়ে শব্দের উপর বহুতর মাত্রারোপ করেছেন, সেই সঙ্গে ব্যক্তি মানুষকে তার সমাজ পরিবেশসহ এক বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আঁকতে গিয়ে ভাষাকে সেই বৃহত্তর অনুষঙ্গে ক্লাসিকধর্মী করে তুলেছেন।

'বাগান' সিরিজে কমলকুমারের চারটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে, এগুলি হল 'বাগান লেখা' (১৯৭৫-জার্নাল) বাগান দৈববানী (গোলকধাধা মে ১৯৭৮), বাগানকেয়ারি

(বারো মাস, ১৩৭৮) এবং বাগান পরিধি (শিরোনাম ১৩৭৮)। এছাড়া কিছু 'বাগান' সিরিজের রচনার উল্লেখ বিভিন্ন সূত্রে রয়েছে যেগুলি প্রকাশিত হয়নি বা পাওয়া যায়নি। বাগান সিরিজের গল্প সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমলকুমার জানিয়েছেন 'বাগান' এতে মানুষের সম্পর্কবোধ সূক্ষ্মতা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি।'[৭৩] 'বাগান লেখা' গল্পটিতে মানুষের এই সম্পর্কবোধের সূক্ষ্মতাকে বিভিন্নভাবে দেখিয়েছেন। গল্পটি ছোট ছোট কতগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। যেমন 'স্বপ্ন', 'মরণ', 'বেদান্ত', 'সংবাদপত্র' 'পুলিশ', টেলিফোন', 'বস্তি', 'বাড়ি', 'যুবতীর কথা' প্রভৃতি। বিভিন্ন থিমকে বিভিন্ন অংশে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোন অংশেই কাহিনী নেই। গল্পরস এখানে প্রাধান্য পায়নি বরং দার্শনিকতা পূর্ণবাক্যে রচনাভারাক্রান্ত হয়েছে। গল্পটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্বোধ্য এবং দুরূহ। ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাই এ গল্পে প্রাধান্য লাভ করেছে। 'বাগান' সিরিজের শ্রেষ্ঠ গল্পহল 'বাগান কেয়ারি'। একটি শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে গল্পটি গড়ে উঠেছে, মৃত্যুর স্বরূপ কী সেটাই যেন লেখক ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই সব শ্রমজীবী মানুষেরা বেঁচে থেকেও কোন পরিচয় পায় না মৃত্যুও হয় তাদের নাম গোত্রহীন ভাবে, মৃত অবস্থায় মৃত বলেও প্রত্যাখ্যাত হয়। পৃথিবী থেকে শ্রমিক বলেও সে স্বীকৃত পায় না। দারোগা তাকে 'ক্রিমিন্যাল' বলে চিহ্নিত করে। এখানে রয়েছে কমলকুমারের সেই সমষ্টি চেতনা। এই সব শ্রমিক মানুষের মৃতদেহকে কেন্দ্র করে পুণ্যলোভী পুণ্য সঞ্চয় করে। আর বিজ্ঞজনেরা দার্শনিকতা পূর্ণ মন্তব্য রেখে তাদের বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পে কমলকুমার গল্প কাহিনীকে প্রাধান্য দেননি, আঙ্গিকগত পরীক্ষা সে তুলনায় অধিক গুরুত্ব পেয়েছে সেই সঙ্গে ভাষার দুরূহতাও লক্ষ্য করা যায় কিন্তু এই 'বাগান কেয়ারি' গল্পটি ব্যতিক্রম।

কমলকুমারের মৃত্যুর পর কিছু গল্প প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ গল্পই অন্যের লেখনীতে সম্পূর্ণরূপ পেয়েছে। 'যেমন 'বাবু', জাস্টিস'

ইত্যাদি গল্পগুলি দয়াময়ী মজুমদার সম্পূর্ণ করেছেন। তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'কাল-ই আততায়ী' (১৯৮০) এবং 'আমোদ বোষ্টমী' (১৯৮৮ দেশ)। কমলকুমার বেঁচেছিলেন পয়ষট্টি বছর। কিন্তু সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছেন শেষ কুড়ি বছর। গল্প লিখেছেন তিরিশটি এর মধ্যে কয়েকটি অসমাপ্ত। প্রথম পর্যায়ের গল্পগুলি ভাবনার ঐশ্বর্যে, পুঙখানুপুঙখ নির্মিতিতে, কাব্য ও চিত্র শিল্পের মেলবন্ধনে বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলি ভাষার দুরূহতার পাঠকের রসগ্রহনে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু একথা স্বীকার করেও বলা যায় যে কমলকুমারের প্রথম পর্যায়ের লেখাতে যে ভাবনা ছিল অর্থাৎ সমষ্টি চেতনা সেটা শেষ পর্যায়ের গল্পগুলিতেও রয়েছে অর্থাৎ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকতাকে তিনি বজায় রেখেছিলেন।

—— 0 ——

তথ্যপঞ্জী

১. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমার মজুমদার, জীবন ও সাহিত্য, অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, ১৯৯০, পৃ.১

২. তদেব, পৃ.৫

৩. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমার মজুমদার, জীবন ও সাহিত্য, অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৯০, পৃ.৭

৪. কমলকুমার মজুমদার - পিঞ্জরেবন্দিয়াস্তক (উপন্যাস), সুবর্ণরেখা, ১৯৭১

৫. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত - 'নিজেকে নিজে', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭১

৬. কমলকুমার মজুমদারের চিঠি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে ১৭.১২.৭১ মিনি বুক প্রকাশ তারিখ নেই।

৭. ডায়েরি কমলকুমার মজুমদার ১৬ই জানুয়ারি - হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, ১৯৯০

৮. দয়াময়ীর স্মৃতিতে কমলকুমার মজুমদার - সাক্ষাৎকার সুব্রত রুদ্র - আজকাল ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫

৯. চিঠি, কমলকুমার মজুমদারে সুব্রত চক্রবর্তীকে ৬.১২.৭০ - হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ।

১০. তদেব

১১. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত - কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরোন কথা - শব্দ পত্র - সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

১২. সত্যজিৎ রায় - 'কমলবাবু', সমতট, জুলাই সেপ্টেম্বর ১৯৭১

১৩. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত - কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরোন কথা - শব্দ পত্র, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

১৪. কমলকুমার মজুমদার - লেখা বিষয়ক, জার্নাল সওর, শারদ সংখ্যা ১৯৭৬

১৫. চিঠি কমলকুমার মজুমদারের সুব্রত চক্রবর্তীকে ৬.১২.৭০ - মালা চক্রবর্তীর সংগ্রহে।

১৬. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - 'কমলকুমার, জীবন ও সাহিত্য' - অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ।

১৭. চিঠি কমলকুমার মজুমদারের সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে ১৮.১.৭২, মিনিবুক

১৮. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - বাংলা ছোটগল্পের তিন শিল্পী, দেশ পত্রিকা ৩০শে ১৯৯২

১৯. সন্তোষকুমার ঘোষ - 'যৌথ খাওয়া' - আনন্দবাজার পত্রিকা ১০.২.৭১

২০. Kamal Majumdar death'- Statesman, 10.2.79

২১. অমরেন্দ্র চক্রবর্তী - 'কমলকুমারের মৃত্যু' - যুগান্তর পত্রিকা ১০.২.৭১

২২. কমলকুমার - 'তেইশ' - কমলকুমার গল্প সংগ্রহ - সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৪৩

২৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - ছোটগল্পের তিন শিল্পী, দেশ, ১৯৯২, ৩০ মে,

২৪. তদেব

২৫. কমলকুমার মজুমদার - 'মল্লিকাবাহার' - কমলকুমার গল্প সমগ্র, সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.৫৭

২৬. তদেব

২৭. দেবেশ রায় - তেইশ বছর আগে পরে, শব্দ পত্র পৃ.৮১

২৮. তদেব

২৯. তদেব

৩০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - বাংলা ছোটগল্পের তিন শিল্পী - দেশ ১৯৯২ ৩০ মে।

৩১. অনিরুদ্ধ লাহিড়ী - পিতাপুত্রর দায়ভাগ ও ভবিতব্য, শব্দপত্র, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

৩২. সুনীল গাঙ্গুলী - বাংলা ছোট গল্পের তিনশিল্পী দেশ ১৯৯২, ৩০ মে

৩৩. কমলকুমার মজুমদার - 'কয়েদখানা' গল্পসমগ্র সম্পাদনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২ পৃ.১৩৬

৩৪. তদেব

৩৫. চিঠি Now পত্রিকার সম্পাদককে, কমলকুমার মজুমদারের - ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৭ হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ।

৩৬. কমলকুমার মজুমদার - ফৌজ-ই-বন্দুক - গল্পসমগ্র, সম্পাদক - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১০৩

৩৭. অমিতাভ দাশগুপ্ত - নিম অন্নপূর্ণা প্রসঙ্গে, সৃজনী

৩৮. অশ্রুকুমার সিকদার - অন্তর্জলী যাত্রার ঘোর বাস্তবতা - আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস - দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩

৩৯. কমলকুমার মজুমদার - 'গোলাপ সুন্দরী'

৪০. তদেব

৪১. দেবেশ রায় - 'তেইশ বছর আগে পরে' - শব্দপত্র, আশ্বিন ১৩৯১

৪২. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত - কাব্যবীজ ও কমলকুমার, নবার্ক পৃ.১৫

৪৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - ছোট গল্পের তিনশিল্পী, দেশ ১৯৯২, ৩০ মে।

৪৪. সুব্রত চক্রবর্তী - শ্রীকমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত - এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২

৪৫. তদেব

৪৬. কমলকুমার মজুমদার - মুক্তিনীকুমার, গল্পসমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১৭০

৪৭. কমলকুমার মজুমদার - লুপ্তপূজাবিধি, গল্পসমগ্র - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১১০

৪৮. সুব্রত চক্রবর্তী - শ্রীকমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২

৪৯. ভগীরথ মিশ্র - 'ভাষার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্র হলো ব্যথা', দ্যোতনা, সপ্তদশ বর্ষ সংখ্যা ১৪০২

৫০. দয়াময়ী মজুমদার - 'আমাদের কথা', কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি - সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত।

৫১. সুব্রত চক্রবর্তী - শ্রীকমলকুমার পরিপ্রেক্ষিত, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২

৫২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় - 'ছোট গল্পের তিন শিল্পী, দেশ, ১৯৯২, ৩০মে

৫৩. রফিক কায়সার - কমলপুরাণ, প্যাপিরাস প্রেস, ঢাকা ১৯৮১, পৃ.১৪

৫৪. কমলকুমার মজুমদার - রুক্মিনীকুমার, গল্পসমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.১৭০

৫৫. রফিক কায়সার - কমলপুরাণ, প্যাপিরাস প্রেস ঢাকা ১৯৮১

৫৬. কমলকুমার মজুমদার - লুপ্ত পূজাবিধি, গল্প সমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গাঙ্গুলী ১৯৯২, পৃ.১১০

৫৭. হিরন্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমার জীবন ও সাহিত্য, - অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৮. কমলকুমার মজুমদার - লেখা বিষয়ক, জার্নাল ৭০, ৫ম সংখ্যা ১৯৭৬

৫৯. কমলকুমারের চিঠি সুব্রত চক্রবর্তীকে

৬০. তদেব

৬১. চিঠি - কমলকুমার মজুমদারের বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকে ২৪.১২.৭৮, চতুরঙ্গ

৬২. চিঠি - কমলকুমার মজুমদারের সাময়ের আনোয়ারকে ২.২.৭৬

৬৩. চিঠি - কমলকুমার মজুমদারের নির্মাল্য আচার্যকে ৬.৩.৬৭

৬৪. কমলকুমার মজুমদার - খেলার বিচার - গল্প সমগ্র, সম্পাদনা - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ. ১২১

৬৫. কমলকুমার মজুমদার - খেলার আড্ডা, গল্পসমগ্র, সম্পাদনা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২, পৃ.২৬৬

৬৬. চিঠি - কমলকুমারের নির্মাল্য আচার্যকে, হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ

৬৭. কমলকুমার মজুমদার - খেলার দৃশ্যাবলী - গল্প সমগ্র, সম্পাদনা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৯২, পৃ.২১৮

৬৮. আলোক সরকার - কমলকুমারের মানুষ ও ভাষা, সমতট, জুলাই - সেপ্টেম্বর ১৯৭১

৬৯. নবনীতা দেবসেন - পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং অথবা সিম্বাতান্ত্রিকের শব্দসাধনা, চতুরঙ্গ মাঘ ১৩৮৪

৭০. বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত - কাব্যবীজ, ১৯৮৫

৭১. রফিক কায়সার - কমলপুরান, প্যাপিরাস প্রেস, ঢাকা, ১৯৮১

৭২. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় - কমলকুমারের জীবন ও সাহিত্য (অপ্রকাশিত, গবেষণাসন্দর্ভ)

৭৩. কমলকুমার - লেখা বিষয়ক, জার্নাল ৭০, ৫ম সংখ্যা, ১৯৭৬

কমলকুমারের রচনাপঞ্জি -

লালজুতো । গল্প । উষ্ণীষ । ভাদ্র ১৩৪৪—

প্রিনসেস । গল্প । উষ্ণীষ । আশ্বিন-কার্তিক ১৩৪৪

মধু । গল্প । উষ্ণীষ । পৌষ ১৩৪৪

বঁধু । কবিতা । উষ্ণীষ । পৌষ ১৩৪৪

জল । গল্প । সাহিত্যপত্র । কার্তিক ১৩৫৫

তেইশ । গল্প । চতুরঙ্গ । কার্তিক-পৌষ ১৩৫৫

রীতির রহস্য । প্রবন্ধ । চতুরঙ্গ । বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৫৬

চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার । প্রবন্ধ । চলচ্চিত্র । আশ্বিন ১৩৫৭ । পুনর্মুদ্রণ
পরিচয় । ২য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৭০

আত্মহত্যা । গল্প । সচিত্র ভারত । ২৮শে পৌষ ১৩৫৭

প্রতিমা পয়জার । ফিচার । সচিত্র ভারত । ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

সংগীত । ফিচার । চতুরঙ্গ । বৈশাখ - চৈত্র ১৩৫৭

মল্লিকা বাহার । গল্প । চতুরঙ্গ । বৈশাখ -আষাঢ় ১৩৫৮

সংগীত । ফিচার । চতুরঙ্গ । শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৫৮

জনগণনা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রচনাগুলি :

1. Pith and Pith Industry Compiled.
2. Small boxes of various kinds compiled.
3. Two small industries using cloth compiled
   a) The Umbrella.
   b) Oil Cloth.
4. The biri industries compiled.

5. Fishing in Bengal compiled.

6. Native Pottery compiled.

7. The brush industries.

8. The indigenous manufacture of Iron.

9. Brass and bell metal industries.

10. A list of iron implements in common use.

11. Gold work - Census report, Part-IC, 1955.

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠান' সমালোচনা । গ্রন্থসমালোচনা। চতুরঙ্গ । মাঘ -চৈত্র ১৩৬৪

মতিলাল পাদরী । গল্প । দেশ । ২২শে চৈত্র ১৩৬৪

বিমল করের উপন্যাস 'দেয়াল' সমালোচনা । গ্রন্থ সমালোচনা । চতুরঙ্গ । বৈশাখ -আষাঢ় ১৩৬৫

তাহাদের কথা । গল্প । দেশ (দুটি সংখ্যায়)। ২০ এবং ২৭শে ভাদ্র ১৩৬৫

অন্তর্জলী যাত্রা । উপন্যাস । নবরং । আশ্বিন ১৩৬৬

কয়েদখানা । গল্প । পরিচয় । (দুটি সংখ্যায়) পৌষ এবং মাঘ ১৩৬৬

নিম অন্নপূর্ণা। গল্প । বক্তব্য । বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৭

ফৌজ-ই-বন্দুক । গল্প । কৃত্তিবাস । শ্রাবণ ১৩৬৭

গোলাপ সুন্দরী । এক্ষণ । এপ্রিল-মে ১৯৬১ । পুনর্মুদ্রণ : কৃত্তিবাস । মাঘ ১৩৮২

রোজনামা । ফিচার । (ধারাবাহিক রচনা) জনসেবক । ৬, ১৩, ১৭ ফাল্গুন ১৩৬৮

ঢোকরা কামার । প্রবন্ধ । সুন্দরম । ১৩৭০

অনিলা স্মরণে । নভলেট । দর্পণ । শারদীয় ১৩৭১

শ্যামনৌকা । গল্প । এক্ষণ । ২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩৭১

লীলাবতী । অনুবাদ । অঙ্কভাবনা । জানুয়ারি ১৯৬৫

শ্যামনৌকা । উপন্যাস । সরাসরি গ্রন্থাকার মুদ্রিত । প্রকাশিত হয়নি। অসম্পূর্ণ । (১৯৬৪-৬৯)

সুহাসিনীর পমেটম । উপন্যাস । কৃত্তিবাস । শারদীয় ১৯৬৫

বাংলার মৃৎশিল্প । প্রবন্ধ । ধারাবাহিক, চারটি সংখ্যায় । সমকালীন । অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ১৩৭২

পরিপ্রেক্ষিত । প্রবন্ধ । দর্পণ । ৬-৫-৬৬

অভিনয় ও কিংবদন্তী । প্রবন্ধ । ফিল্ম । ১৯৬৬ বার্ষিক সংখ্যা ।

বঙ্গীয় শিল্পধারা । প্রবন্ধ । এক্ষণ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ । পুনর্মুদ্রণ : পরিক্রমা । প-ব-প্রদেশ কংগ্রেস স্মারক পত্রিকা ১৯৭২

রুক্মিনীকুমার । গল্প । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৭৫

কঙ্কালের টঙ্কার । নাট্যরূপ । অন্বীক্ষণ । শারদ ১৩৭৫

বাংলার টেরাকোটা । প্রবন্ধ । উত্তরকাল । আষাঢ় ১৩৭৬

পিঞ্জরে বসিয়া শুক । উপন্যাস । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৭৬

নাচুরালিজম । প্রবন্ধ । নিষাদ। অক্টোবর ১৯৭০ পুনর্মুদ্রণ : বিজ্ঞাপন । কার্তিক ১৩৮৩

পূর্ববঙ্গ সংগ্রাম বিষয়ে । প্রবন্ধ । দর্পণ । দুটি সংখ্যায় । ৭ ও ১৪ মে ১৯৭১

মার্শেল প্রুস্ত বিষয়ে কিছু । প্রবন্ধ । পদক্ষেপ । শারদ ১৩৭৮

শ্যামনৌকা । (নতুন অংশ)। গল্প । গল্প কবিতা । শারদ ১৩৭৮

লুচপূজাবিধি । গল্প । কৃত্তিবাস । জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭২

ক্যালকাটা পেন্টার্স । প্রবন্ধ । দর্পণ । ৩০ মার্চ ১৯৭২

ফাৎনা মনস্কতা । প্রবন্ধ । কৃত্তিবাস । জুন ১৯৭২

'কথা ইশারা বটে' - ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন । প্রবন্ধ । সমতট ।
অক্টোবর - ডিসেম্বর ১৯৭২

বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ । প্রবন্ধ । এক্ষণ । ৪র্থ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা ১৩৭১

যাঁরা গড়েছেন । সাক্ষাৎকার । সমতট ২১-২২ । ১৯৭২

অজ্ঞাত নামার নিবাস । গল্প । আবহ । শারদ ১৩৮০

ইদানীন্তন শিক্ষা প্রসঙ্গ । প্রবন্ধ । কালি কলম । আশ্বিন ১৩৮০

রেখো মা দাসেরে মনে । প্রবন্ধ । কৃত্তিবাস । জানুয়ারি - জুন ১৯৭৪

দ্বাদশ মৃত্তিকা । গল্প । এক্ষণ । শারদ ১৩৮১

স্বাতি নক্ষত্রে জল । গল্প । কালিকলম । আশ্বিন ১৩৮১

অনিত্যের দায়ভাগ । গল্প । আবর্ত । আশ্বিন ১৩৮১

নির্বাচিত গ্রন্থ । প্রবন্ধ । কস্তুরী । এপ্রিল ১৯৭৫

ভাবপ্রকাশ বিষয়ে । প্রবন্ধ । শারদ । মে-জুন ১৯৭৫

আর চোখে জাগে । গল্প । অমল দাস । বৈশাখ ১৩৮২

বাগান লেখা । গল্প । জার্নাল ৭০ । সেপ্টেম্বর ১৯৭৫

শরৎবাবু ও ব্রাহ্মণ্য । প্রবন্ধ । আঁতুর । আশ্বিন ১৩৮২

খেলার দৃশ্যাবলী । গল্প । গাঙেঁয়পত্র । চৈত্র ১৩৮২

বাগান দৈববাণী । গল্প । গোলকধাঁধা । গ্রীষ্ম ১৩৮৩

কলকাতার গঙ্গা । প্রবন্ধ । আনন্দবাজার পত্রিকা । ২০.১১.১৯৭৬

প্রতীক জিজ্ঞাসা । প্রবন্ধ । শারদ । প্রতীক সংখ্যা ১৩৮৩

লেখা বিষয়ক । প্রবন্ধ । জার্নাল ৭০ । ৫ম সংখ্যা ১৯৭৬

খেলার প্রতিভা । উপন্যাস । জার্নাল ৭০ । জানুয়ারি ১৯৭৭

শরৎবাবু বিষয়ক নোট । প্রবন্ধ । সত্তর দশক । এপ্রিল-জুন ১৯৭৭

সীতেশ রায়ের ছবিতে বাঙালী ধরন দেখা যায়। রিভিয়ু । শিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনীর স্যুভেনিরের ভূমিকা । জুলাই ১৯৭৭

ছাপাখানা আমাদের বাস্তবতা । প্রবন্ধ । দেশ । ১৯-৮-১৯৭৮

খেলার আরম্ভ । গল্প । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৮৫

খেলার বিচার । গল্প । কৌরব । শারদীয় ১৩৮৫

বাগান কেয়ারী । গল্প । বারো মাস । শারদীয় ১৩৮৫

বাগান পরিধি । গল্প । শিরোনাম । শারদীয় ১৩৮৫

গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম । প্রবন্ধ । সংস্কৃতি পরিক্রমা । আশ্বিন ১৩৮৫

সাক্ষাৎ ভগবৎ দর্শন । প্রবন্ধ । বিভাব । শরৎ ১৩৮৫

আইকম বাইকম । প্রবন্ধ । তালতমাল । শরৎ ১৩৮৫

গ্রন্থ :

অন্তর্জলী যাত্রা । উপন্যাস । কথাশিল্পী প্রকাশনী । ১৩৬৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ সুবর্ণরেখা থেকে প্রকাশিত ১৩৮৫

নিম অন্নপূর্ণা । গল্প সংকলন । কথাশিল্প । ১৩৭০

গল্প সংগ্রহ । সুবর্ণরেখা । ১৩৭২

দানসা ফকির । নাটক । সুবর্ণরেখা । ১৩৮২

খেলার প্রতিভা । উপন্যাস । তাম্রলিপি । ১৩৮৪

সংকলন :

ঈশ্বর কোটির রঙ্গকৌতুক । কথাশিল্প ১৩৮৪

সংকলন ও চিত্রণ :

ঈশ্বর গুপ্তের ছড়া ও ছবি । উডকাট । কাহিনী । ১৯৬১

আইকম বাইকম । ছড়া সংকলন ও ড্রয়িং । কথাশিল্প । ১৩৭০
পানকৌড়ি । ছড়া সংকলন ও উডকাট । সুবর্ণরেখা । ১৩৭২

মৃত্যুর পর প্রকাশিত :

গ্রন্থ :

পিঞ্জরে বসিয়া শুক । উপন্যাস । সুবর্ণরেখা । ১৩৮৫
গোলাপ সুন্দরী । গল্প । আনন্দ পাবলিসার্স । ১৯৮২
সুহাসিনীর পমেটম । উপন্যাস । আনন্দ । ১৯৮৩
অমিলা স্মরণে । উপন্যাস । আনন্দ । ১৯৮৪
শবরী মঙ্গল । উপন্যাস । সুরলিপি । ১৯৮৪
পানকৌড়ি । (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ছড়া ও ছবি । আনন্দ । ১৯৮৬
গল্প সমগ্র । আনন্দ । ১৯৯০
শিল্প চিন্তা । প্রমা (গবেষণা পত্র জমা দেওয়ার দিন পর্যন্ত প্রকাশিত)

পত্রিকার পাতায় (গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অসংকলিত) :

একটি কবিতা । কবিতা । এক্ষণ । শারদীয় ১৯৭৯
একটি অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ । প্রবন্ধ । অক্ষক্রীড়া। শারদ ১৯৭৯
অপ্রকাশিত রচনা । সংকলন । এক্ষণ । শারদীয় ১৩৮৬
কিঞ্চিৎ জীবন চরিত । গল্প । কৃত্তিবাস । শারদীয় ১৩৮৭
টুকরো রচনা । সংকলন । প্রতিবিম্ব । বৈশাখ ১৯৮০
কালই আততায়ী । গল্প । কৃত্তিবাস । শারদীয় ১৯৮০
সংখ্যা আমার ভাই । প্রবন্ধ । বিভাব । জুলাই ১৯৮০

—

* পিঙ্গলাবৎ । গল্প । কবিতীর্থ । অকটোবর ১৯৮২

* শবরী-মঙ্গল । উপন্যাস । রবিবাসর । শারদীয় ১৯৮৩

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা । জীবনী । কৌরব । অকটোবর ১৯৮৪ (অসম্পূর্ণ)

স্মরণে গোলাপ । কবিতা । চতুরঙ্গ । অকটোবর ১৯৮৪

* বাবু । গল্প । আজকাল । শারদ ১৯৮৭

নৌকোবিলেস । গল্প । প্রতিক্ষণ । শারদ ১৯৮৭

* আস্টিশ । গল্প । পরিচয় । শারদীয় ১৯৮৭

আমোদ বোষ্টমী । গল্প । দেশ । শারদীয় ১৯৮৮

** ছড়া । আনন্দ মেলা। শারদীয় ১৯৮৮

সোনার কাজ । প্রবন্ধ । কবিতীর্থ । শারদীয় ১৯৮৯

প্রেম । গল্প । গল্পসমগ্র । আনন্দ । ১৯৯০

ভূখন্ড । নাটক । কবিতীর্থ । শারদ ১৯৯০

সম্ভাব্য রচনা :

(যার কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি, কিন্তু নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে তা লিখিত প্রকাশিত হয়েছিল।)

শঁশঃ । কবিতা । সূত্র সত্যজিৎ রায়ের 'কমলবাবু' প্রবন্ধ । সমতট । শারদীয় ১৩৮৫

দুর্গাম । নাটক । সূত্র : উষ্ণীষ আশ্বিন ১৩৪৪ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ।

---

* চিহ্নিত রচনাগুলি দয়াময়ী মজুমদারের হস্তাবলেপনে সম্পূর্ণ।

** চিহ্নিত রচনাটি কমলকুমারের নয়। কমলকুমারের নামে ছাপা হয়েছে।

পত্রিকা সম্পাদনা :

উষ্ণীষ । মাসিক । ১৩৪৪ । তিনটি সংখ্যা । সাহিত্য পত্র।
চলচ্চিত্র । মাসিক । ১৯৫০ । একটি সংখ্যা । চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্র ।
তদন্ত । সাপ্তাহিক । ১৯৫২ । ১৮টি সংখ্যা । গোয়েন্দা পত্র।
অঙ্কভাবনা । ত্রৈমাসিক । ১৯৬৫ । দুটি সংখ্যা । গণিত বিষয়ক পত্র ।
গঙ্গাহৃদি । পরিকল্পিত । প্রকাশিত হয়নি । ধর্মবিষয়ক পত্র ।

প্রচ্ছদ চিত্রণ :

কৃত্তিবাস । ২২ নং সংকলন । ১৯৬৫
কৃত্তিবাস । ২৫ নং সংকলন । ১৯৬৮
পঞ্চতন্ত্র । ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা । ১৯৭০
কৌরব । শারদীয় ১৩৮৫
প্রেমিক সন্যাসী । সম্পাদক । সুব্রত রুদ্র । কাব্য সংগ্রহ । ১৯৭৬
প্রতিদিন প্রতি রাত্রি বেলা । কাব্যগ্রন্থ । শুভ মুখোপাধ্যায় । ১৩৮৪
প্রিয় সুব্রত । ভাস্কর চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ । ১৯৭৮
অপরূপ কথা । গল্প । সতীকান্ত গুহ।
এবং মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত নিজের সমস্ত বইগুলি ।

গ্রন্থচিত্রণ । অলংকরণ :

লালকমল নীলকমল । সতীকান্ত গুহ। ১৩৭৪

মৃত্যুর পর প্রচ্ছদ হিশেবে ব্যবহৃত ছবি :

সমতট । আশ্বিন ১৯৭১
দেশ । ২২.৭.৮০

শব্দপত্র । আশ্বিন ১৯৮৬

ব্যাস প্রকাশ । বইমেলা ১৯৮৮

চিত্রপ্রদর্শনী :

১৯৭৯, ১৯ ফেব্রুয়ারি । ২৫টি ছবি। আকাদেমি অব ফাইন আর্টস নর্থ গ্যালারি, এক সপ্তাহ।

১৯৭৯, ১৩-১৯ মার্চ । ২৫টি ছবি । আকাদেমি অব ফাইন আর্টস, নর্থ গ্যালারি। এক সপ্তাহ

১৯৮৪, ৭-৩০ মার্চ । ২৮টি ছবি । আকাদেমি অব ফাইন আর্টস। সাউথ গ্যালারি । ২৪ দিন ।

১৯৮৫। ১০-১৭ জুন । ৩০টি ছবি । আকাদেমি অব ফাইন আর্টস নর্থ গ্যালারি । এক সপ্তাহ ।

- প্রদর্শনীর আয়োজক : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ।

পরিচালিত নাটক :

মৃদিস্পৃক । কমলকুমার মজুমদার । মঞ্চ : টালিগঞ্জ থানার মোটর গ্যারেজ । ১৯৩২ সাল । সঠিক তারিখ জানা যায় নি । দল - উল্কা ।

(১৯৩২-৫১ পর্যন্ত কমলকুমার পরিচালিত নাটকের কোনো তারিখ বা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি । অথচ কমলকুমার নাটক পরিচালনা করেছিলেন সেই সময় এমন তথ্য পাওয়া গেছে।)

লক্ষণের শক্তিশেল । সুকুমার রায় । মঞ্চ : সিগনেট প্রেস । নিউ এম্পায়ার । বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । দল : হরবোলা । চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । তারিখ : ১৯৫২(সঠিক তারিখ পাওয়া যায় নি।)।১০.১০.৬৭।৫.২.৭৭

মুক্তধারা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । মঞ্চ : সিগনেট প্রেস । দল : হরবোলা ১৯৫২ । ৫৩ (সঠিক তারিখ পাওয়া যায় নি।)

রামায়ণ গাথা । কমলকুমার মজুমদার । মঞ্চ : নিউ এম্পায়ার । দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । ১০১০১৯৬৭ । সকাল ১০টা।

এম্পারার জোনস । ইউজিন ও নীল । অনুবাদ : গগন দত্ত । মঞ্চ : মুক্তাঙ্গন । নিউ এম্পায়ার । কলা মন্দির । তারিখ : ৯০২০১৯৬৪ । ১৪০৭০১৯৬৮ । ২০১০৭০ দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ।

দানসা ফকির । কমলকুমার মজুমদার । মঞ্চ : বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন । তারিখ : ২৮০১১০৭৬, ২১০১০৭৬ । ১১০১০৭৭ । দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । ক্যালকাটা চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ।

কংকালের টংকার । কাহিনী : মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । পালরূপ : কমলকুমার । মঞ্চ : বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন । তারিখ : ২১০১০৭৬ । ১১০১০৭৭, দল : চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ । ক্যালকাটা চিলড্রেন অপেরা গ্রুপ ।

ভীমবধ । নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । মঞ্চ : বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন । বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন । তারিখ : ২৮০১১০৭৬ । ১১০১০৭৭ দল : ক্যালকাটা চিলড্রেন গ্রুপ।

অভিনয় হয়নি অথচ তৈরি ছিল এমন নাটক :

লক্ষ্মীর পরীক্ষা । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

হ-য-ব-র-ল । সুকুমার রায় ।

সুলতানা রিজিয়া । কমলকুমার মজুমদার ।
ঠোক্কর । কমলকুমার মজুমদার ।
হরচন্দ্রের অশান্তি । কমলকুমার মজুমদার ।
ঘোড়াচোর । কমলকুমার মজুমদার ।
প্রহ্লাদ চরিত । কমলকুমার মজুমদার ।
কবিকঙ্কন চণ্ডী । কমলকুমার মজুমদার
প্রহ্লাদ চরিত । কমলকুমার মজুমদার ।
কবিকঙ্কন চণ্ডী । কমলকুমার মজুমদার ।
যমালয়ে জীবন্ত । কমলকুমার মজুমদার ।
ডন কুইক্সোটের আক্কে । কমলকুমার মজুমদার ।
আলীবাবা । ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ।
আনমগীর । গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

যে সব কাহিনী চলচ্চিত্রিত হয়েছে ।

নিম অন্নপূর্ণা । পরিচালক । বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত । ১৯৮০
অন্তর্জলী যাত্রা । পরিচালক : গৌতম ঘোষ । ১৯৮৯ ।
তাহাদের কথা । পরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত।

যে সব সংকলনে কমলকুমারের রচনা গৃহীত :

কিশোর অমনিবাস । সম্পাদক : ধীমান দাশগুপ্ত । গৃহীত রচনা : আইকম বাইকম । বাণী শিল্প । ১৩৮৪
দেশ সুবর্ণ জয়ন্তী গল্প সংকলন । সম্পাদনা : সাগরময় ঘোষ । গৃহীত গল্প : যতিলাল পাদরী । আনন্দ । ১৯৮৩

গোলাপ যে নামে ডাকো । সম্পাদক : পূর্ণেন্দু পত্রী । গৃহীত গল্প : গোলাপ সুন্দরী । প্রতিক্ষণ । ১৯৮৬

দেশ শারদীয় গল্প সংকলন । সম্পাদনা : সাগরময় ঘোষ । গৃহীত গল্প : আমোদ বোষ্টমী। আনন্দ । ১৯৮৮